শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
১০ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের, যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দু শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran(এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৮ হিঃ
আগস্ট ১৯৯৭ইং
শ্রাবণ ১৪০৪ বাং

সূচীপত্র

সূরা আন-নাবা

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াত عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ এর النَّبَا শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এ কেবল নামই নয় সূরার আলোচিত বিষয়াদির শিরোনামও। কেননা 'নাবা' শব্দের অর্থ কিয়ামত ও পরকালের সংবাদ দান। আর সূরার সমস্ত আলোচনাই কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বর্তমান সূরার পূর্ববর্তী সূরা 'আল মুরসালাত-এর ভূমিকায় আমরা যেমন বলেছি, সূরা কিয়ামাহ হতে সূরা নাযিয়াত পর্যন্ত সব কটি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের। আর এ সবকটি সূরাই রসূলে করীমের মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু আলোচনা

এ সূরায় প্রায় সে সব কথাই বলা হয়েছে, যা ইতি পূর্বে সূরা 'আল মুরসালাত-এ বলা হয়েছে। আর তা হ'ল কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ এবং তা মেনে নেয়া ও অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে লোকদিগকে অবহিতকরণ। মক্কা শরীফে নবী করীম (সঃ) যখন প্রথম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন, তখন তার কাজের ভিত্তি ছিল তিনটি। প্রথম, উলুহিয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক না করা- শরীক না মানা। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে রসূল বানিয়েছেন। আর তৃতীয়, একদিন এ জগত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অতঃপর আর একটি জগত তৈরী হবে; তখন সমস্ত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে ও হাশরের ময়দানে ঠিক সেই দেহ ও শরীরসহ উপস্থিত করা হবে যে দেহ ও শরীর নিয়ে তারা দুনিয়ার জীবনে কাজ করেছে। পরে তাদের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের হিসাব নেয়া হবে। এ হিসাব-নিকাশে যারা দুনিয়ায় ঈমানদার ও নেক-চরিত্রবান ছিল বলে প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্যে জান্নাতে যাবে ও সেখানেই বসবাস করবে, পক্ষান্তরে যারা কাফের ও 'ফাসেক' প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামবাসী হবে।

এ তিনটি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি মেনে নেয়া যদিও মক্কাবাসীদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল- যদিও এ তাদের মোটেই পছন্দ ছিল না, কিন্তু তবুও মোটামুটিভাবে তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। তারা এ কথাও মানতো যে, আল্লাহই সর্বোচ্চ রব তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। আল্লাহ ছাড়া আর যেসব সত্তাকে তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল সে সবকে তারা আল্লাহরই সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতো। এ কারণে উলুহিয়াতের গুণ ও ক্ষমতা ইখতিয়ার এবং ইলাহর মূল সত্তায় ঐসবের কোন অংশীদারিত্ব আছে বা নেই, কেবলমাত্র এই প্রশ্ন নিয়েই তাদের সাথে মতবিরোধ ঘটেছিল।

দ্বিতীয় কথাটি মক্কার লোকেরা মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সঃ) নবুয়্যতের দাবী প্রকাশ করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যেই জীবন-যাপন করেছেন এবং এ সময় তারা তাঁকে কখনও মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ কিংবা আত্মস্বার্থের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারীরূপে দেখতে পায়নি,-এ ব্যাপারটা অস্বীকার করার তাদের কোনই উপায় ছিল না। নবী করীমের (সঃ) বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সুস্থমতিত্ব এবং উন্নত চরিত্রের কথা তারা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতো। এ কারণে শত রকমের টালবাহানা ও অভিযোগ রচনা সত্ত্বেও

তা অন্য লোকদের বিশ্বাস করানো দূরের কথা, তাদের নিজেদের পক্ষেও এসব কথা সত্য বলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল না। নবী করীম (সঃ) সব ব্যাপারেই যখন সত্যবাদী ও সত্যপন্থী, তখন কেবল নবুয়্যতের ব্যাপারে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী হবেন, এ কথা নিজেরাই বা কিভাবে সত্য বলে মানবে, আর অন্যদেরকে বা তা কিভাবে বিশ্বাস করাবে, এ ছিল তাদের জন্যে একটি মুশকিল ব্যাপার। তৃতীয় কথাটি মক্কাবাসীদের পক্ষে প্রথম দু'টো কথার চাইতে অনেক বেশি আপত্তিকর ছিল। এ কথাটা যখন তাদের সম্মুখে পেশ করা হ'ল তখন এ কথাকে তারা সবচাইতে অধিক বিদ্রুপ করলো। এ কথাটাই তাদের সর্বাধিক বিস্ময়কর মনে হ'ল। তাকে তাদের জ্ঞান-বিবেক বিপরীত ও বাস্তবতার দিক দিয়ে অসম্ভব মনে করে নানা স্থানে তারা তাকে বিশ্বাস-অযোগ্য ও ধারনারও অতীত বলে প্রচার করতে শুরু করলো। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার জন্য সর্ব প্রথম পরকাল বিশ্বাসী বানানো ছিল একান্তই অপরিহার্য। পরকালের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না নিলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে নির্ভুল চিন্তা পদ্ধতি গ্রহণ, ভালো-মন্দ নির্ধারণের মানদন্ড পরিবর্তন, এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে ইসলাম প্রদর্শিত পথে চলা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ঠিক এ কারণেই মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরা সমূহে লোকদের মনে পরকাল বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে দেয়ার জন্যেই সর্বাধিক চেষ্টা চালানো হয়েছে, এর ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এতে উচ্চতর বলিষ্ঠ ভাষাও গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য সেজন্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে এমন ভংগি অবলম্বন করা হয়েছে যাতে আল্লাহর একত্ব ও তওহীদ বিশ্বাস আপনা-আপনিই লোকদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসে যায়। মাঝে মাঝে রসূলে করীম ও কুরআন মজীদের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিসমূহও সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে।

এ আলোচনা হ'তে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহে পরকালের কথা বার বার আলোচিত হবার কারণও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। অতঃপর সূরাটিতে আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেয়া আবশ্যক। পরকাল হবার কথা শুনতে পেয়ে মক্কাবাসীরা প্রতিটি অলি-গলি ও সভা-সমিতিতে যেসব আলোচনা পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছিল, এ সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকাল অবিশ্বাসী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; তোমরা কি এ পৃথিবী-এ যমীন দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ উচ্চ শৃংগ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না? তাকে তো আমিই মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদেরকেও দেখতে পাওনা? তোমাদেরকে পুরুষ ও নারীর জোড়া জোড়া রূপে আমি বানিয়েছি, তা কি কখনো ভেবে দেখ না? তোমাদেরকে বৈষয়িক কাজের যোগ্য করে রাখার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর কয়েক ঘন্টা কাল বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে তোমাদেরকে বাধ্য করেছি- এ কি তোমাদের বিবেচনার বিষয় বলে মনে হয় না? রাত-দিনের নিয়মিত আবর্তন কি তোমাদের চোখে পড়ে না? এ তো তোমাদেরই প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা সহকারে ও অব্যাহতভাবে কার্যকর করে রেখেছি। তোমাদের উর্ধ্বলোকে- আকাশমন্ডলে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার প্রতি কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না? সূর্যটা দেখতে পাও না? তার দ্বারাই তো তোমরা আলো ও উত্তাপ লাভ করে থাক। শূন্যলোকে ভাসমান মেঘমালা গলে গলে এই যে বৃষ্টিপাত হয়, তার সাহায্যে শস্য, শাক-সবজি ও ঘন-সন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা উদ্ভূত হয় এও কি তোমাদের চোখে পড়ে না? এই সমস্ত জিনিস কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, যে নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা এসবকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি কিয়ামত সৃষ্টি করতে ও পরকাল আনয়নে অক্ষম? সৃষ্টিলোকের এই বিশাল-বিরাট কারখানায় যে উচ্চ ও পরিপূর্ণ মানের বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা সুস্পষ্ট ও ভাস্বর হয়ে রয়েছে তা কি তোমাদের বোধগম্য হয়েছে? এই কারখানার প্রতিটি অংশ ও প্রত্যেকটি কাজের তো একটা উদ্দেশ্য বা কার্যকারীতা আছে-যা অনস্বীকার্য, তাহলে এ সম্পূর্ণ কারখানাটির কোন সামগ্রিক ও সম্যক উদ্দেশ্য নেই-বরং তা

উদ্দেশ্যহীন, এ কথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে? এ কারখানায় মানুষকে ফোরম্যান (Foreman) এর পদে অধিষ্ঠিত করে তাকে প্রচুর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তাকে তোমরা দেখতে পাও এবং বুঝতে পার; কিন্তু সে যখন কারখানার কাজ সমাপ্ত করে এখান হতে বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখন তাকে এমনি ই ছেড়ে দেয়া হবে? ভালো কাজ করার জন্যে তাকে কোন পুরস্কার বা পেনশন এবং খারাপ কাজ করার দরুণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা শাস্তি দেয়া হবে না,- এ যে একেবারে অর্থহীন ও বোকামির কথা, তাও কি তোমাদের মাথায় আসে না?

এসব যুক্তি ও দলীল প্রমাণ দেয়ার পর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত বিচারের দিন নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ই উপস্থিত হবে তার আসার জন্য শিংগায় একটি ফুঁক দেয়ার অপেক্ষা মাত্র। আজ তোমাদেরকে যেসব অবস্থার কথা আগাম বলা হচ্ছে তা সবই সেদিন অবশ্যই এসে উপস্থিত হবে। আজ তোমরা এ মানো আর না-মানো সে সময় তোমরা যেখানেই মরে পড়ে থাকবে, সেখান হতেই নিজেদের হিসাব-নিকাশ পেশ করার জন্যে দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের আজকের অস্বীকার ও অমান্যতা সে দিনটির উপস্থিতিও অবস্থিতিকে মাত্রই রুখতে পারে না।

এর পর ২১-৩০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক হিসাব-নিকাশ হবে বলে আশা পোষণ করেনা এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদের প্রতিটি কাজ পুরোপুরিভাবে আমাদের নিকট লিখিত রয়েছে এবং তাদের শাস্তিদানের জন্যে জাহান্নাম উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে। সেখানে তাদের আমলের পুরোপুরি প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে। যেসব লোক নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করে দুনিয়ার জীবনে পরকালীন জীবনকে সুখী ও সুন্দর বানাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, পরবর্তী ৩১-৩৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদেরকে অতি উত্তম প্রতিফল দানের কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই উত্তম কাজসমূহের কেবল প্রতিফল-ই দেয়া হবেনা, তার-ও অধিক যথেষ্ট পুরস্কার তাদেরকে দেয়া হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহর বিচারালয়ের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেখানে কারো পক্ষে ঘাড় বাঁকা করে বসার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। নিজস্ব দল-বল, সংগী-সাথী ও মুরীদ-মু'তাকিদদের ক্ষমা করিয়ে দেয়ারও সাধ্য কারো থাকবে না। শুধু তাই নয়, অনুমতি দেয়া হলেও তা দেয়া হবে এই শর্তে যে যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি হবে, সে কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে এবং সে সুপারিশ করার অনুমতিও দেয়া হবে কেবলমাত্র সেই লোকদের জন্যে যারা দুনিয়ায় ইসলামের কলেমায় বিশ্বাসী ছিল, আর শুধু গুনাহগার তারা, অন্য কিছু নয়। বস্তুতঃ আল্লাহদ্রোহী ও সত্যদ্বীন-অমান্যকারী লোক কোনরূপ সুফারিশ লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হবে না।

এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সূরাটি শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনটির (কিয়ামতের) আগমন সম্পর্কে আগাম খবর দেয়া হয়েছে তার আগমন সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উপরন্তু সেদিনটি দূরে নয়, খুবই নিকটে অবস্থিত। এখন যার ইচ্ছা সে সেই দিনটি মেনে নিয়ে স্বীয় আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী শুনার পরও যারা তাকে অস্বীকার করবে তার যাবতীয় কৃত-কর্ম তারই চোখের সামনে পেশ করা হবে। অতঃপর অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। সে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলবেঃ হায়! আমি যদি দুনিয়ায় পয়দা-ই-না হতাম তা হলে কতইনা ভালো হ'ত। সেদিন তার এরূপ অনুভূতি হবে সেই জগত সম্পর্কে যার জন্যে আজ সে পাগলপারা হয়ে ছুটেছে।

দুই তার রুকু মক্কী নাবা সূরা চল্লিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ① عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ② الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ

সে বিষয়ে তারা তা (এমন যে) বিরাট (অর্থাৎ কিয়ামত) সংবাদ সম্পর্কে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কি সম্পর্কে

مُخْتَلِفُوْنَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤ اَلَمْ نَجْعَلِ

আমরা বানাই নাই কি তারা শীঘ্র জানবে কক্ষণওনা আবার (বলি) তারা শীঘ্র জানবে কক্ষণওনা (নিজেরাই) মতানৈক্যকারী

الْاَرْضَ مِهٰدًا ⑥ وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑦ وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑧

জোড়া জোড়া তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি এবং কীলক স্বরূপ পাহাড়-পর্বত সমূহকে এবং বিছানা স্বরূপ যমীনকে

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨

বিশ্রাম (শান্তির বাহন) তোমাদের ঘুমকে আমরা বানিয়েছি এবং

সূরা আন-নাবা

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪০ মোট রুকু ঃ ২

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। এই লোকেরা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
২। সেই বড় সংবাদ সম্পর্কে কি?
৩। যে বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের উক্তি করতে লিপ্ত?
৪। কক্ষণও নয়[১] অতি শীঘ্রই তাহারা জানতে পারবে।
৫। আবার বলি কক্ষণই নয় অতি শীঘ্রই তাহারা জানতে পারবে।
৬। ইহা কি সত্য নয় যে, আমরাই যমীনকে শয্যা বানিয়েছি,
৭। পাহাড় পর্বতসমূহকে কীলক স্বরূপ গেড়ে দিয়েছি।
৮। এবং তোমাদেরকে (নারী -পুরুষের) জোড়ারূপে পয়দা করেছি'
৯। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করেছি।

১। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে এরা যেসব মনগড়া কথা রচনা করে, তা সবই মিথ্যা আর যা কিছু বুঝে রেখেছে তা আদৌ ঠিক নয়।

وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

এবং আমরা বানিয়েছি রাতকে আবরণ স্বরূপ এবং আমরা বানিয়েছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়

وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا

এবং আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সাত সুদৃঢ় (আসমান) এবং .আমরা বানিয়েছি প্রদীপ (সূর্য)

وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ

উজ্জ্বল এবং আমরা বর্ষণ করেছি হতে মেঘমালা পানি অবিশ্রান্ত এজন্য যে বের করব আমরা

بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۝١٥ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

তা দিয়ে শস্য ও উদ্ভিদ এবং বাগিচা সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট নিশ্চয় দিন বিচারের

كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ

আছে নির্দিষ্ট সেদিন ফুঁদেওয়া হবে মধ্যে শিঙ্গার অতঃপর তোমরা আসবে

اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّ

দলে দলে এবং সেদিন উন্মুক্ত করা হবে আকাশ অতঃপর তা হবে দরজা দরজা এবং

سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

চালিয়ে দেয়া হবে পাহাড়গুলো অতঃপর তা হবে মরীচিকা

১০-১১। রাতকে আচ্ছাদনকারী ও দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি;

১২। তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ-মন্ডল সংস্থাপিত করেছি।

১৩। এবং এক অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত প্রদীপ [২] বানিয়েছি ;

১৪। মেঘমালা থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি

১৫-১৬। এই উদ্দেশ্যে যে, এর সাহায্যে শস্য, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উদ্ভাবন করব।

১৭। চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন।

১৮। সেই দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে ;তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।

১৯। আর আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে- ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ার হয়ে দাঁড়াবে।

২০। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তা কেবল মরীচিকায় পরিণত হবে।

২। অর্থাৎ সূর্য। মূলে وهّاج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অত্যন্ত গরমও হয় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বলও হয়। এ কারণে অনুবাদে দু'টি অর্থই লিখিত হয়েছে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ

নিশ্চয় · জাহান্নাম · হলো · ঘাঁটি · সীমা লংঘনকারীদের জন্য · প্রত্যাবর্তনস্থল · তারা অবস্থানকারী হবে

فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا

তার মধ্যে · যুগ যুগ ধরে · না · তারা স্বাদ গ্রহণ করবে · তার মধ্যে · ঠাণ্ডা · আর · না · পানীয় · এব্যতীত

حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

উত্তপ্ত পানি · ও · পুঁজ · (এটাই তাদের) প্রতিদান · উপযুক্ত · নিশ্চয় · তারা · (এমন) ছিলো যে · না · আশা করতো

حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ

হিসাবের · এবং · তারা মিথ্যারোপ করত · আমাদের আয়াত গুলোকে · (সম্পূর্ণ ভাবে) মিথ্যা · এবং · সব · কিছু

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

তা আমরা গুনে রেখেছি · লিখিত (আকারে) · তোমরা অতএব স্বাদ লও · অতঃপর কক্ষণ না · তোমাদের আমরা বাড়াবো (অন্যকিছু) · এছাড়া · শাস্তি

২১। প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ[৩]

২২। খোদাদ্রোহীদের জন্যে আশ্রয়স্থল।

২৩। যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে[৪]।

২৪। সেখানে তারা ঠান্ডা ও পানোপযোগী কোন জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না।

২৫। কিছু পেলেও পাবে কেবল উত্তপ্ত পানি ও ক্ষতের ক্ষরণ।

২৬। (তাদের কীর্তি-কলাপের) পূর্ণমাত্রার প্রতিফল।

২৭। তারা তো কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না,

২৮। এবং আমাদের আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ (মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করত।

২৯। আর অবস্থা এই ছিল যে, আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ই গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।

৩০। এখন স্বাদ লও, আমরা তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।

৩। শিকার ধরার জন্যে নির্মিত বিশেষ স্থানকে ঘাঁটি বলা হয়। শিকার অসাবধানে আসে এবং তাতে আটকা পড়ে। জাহান্নামকে ঘাঁটি বলার কারণ খোদাদ্রোহী লোকেরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বে-পরওয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে নেচে-কুদে বেড়ায়, তারা মনে করে খোদার এই বিশাল জগৎ যেন তাদের জন্যে এক উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র, এবং এখানে ধরা পড়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্যে এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি স্বরূপ হয়ে আছে। এর মধ্যে তারা আকস্মিকভাবে আটকে পড়বে এবং এভাবেই আটকে পড়ে থাকবে।

৪। কুরআনে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হলো আহকাব। এর অর্থ ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ সময়, পরপর আগত এমন যুগ-সমূহ যার একটির অবসানের সংগে সংগে দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়ে যায়।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّ كَوَاعِبَ

নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্যে সাফল্য (রয়েছে) বাগিচাসমূহ ও আংগুর সমূহ এবং নব্য যুবতীরা

اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ

সমবয়স্কা এবং পানপাত্র উচ্ছসিত না তারা শুনবে তার মধ্যে কোন বেহুদা কথা আর

لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ

না মিথ্যা প্রতিদান পক্ষ হতে তোমার রবের (এছাড়াও) দান যথোচিত (পক্ষ হতে) রবের আসমানসমূহের

وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

এবং পৃথিবীর এবং যা কিছু তাদের দুইয়ের মাঝে আছে অশেষ দয়াবানের (পক্ষ হতে) না তারা সক্ষম হবে তাঁর সাথে কথা বলতে

রুকু ঃ ২

৩১। নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্যে একটা সাফল্যের মর্যাদা রয়েছে।

৩২। বাগ-বাগিচা, আংগুর

৩৩। ও সমবয়স্কা নব্য যুবতীরা

৩৪। এবং উচ্ছসিত পান-পাত্র।

৩৫। সেখানে তারা কোনরূপ অপ্রয়োজনীয়, তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না,

৩৬-৩৭ প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার [৫], তোমাদের রবের নিকট হতে, সেই অতীব দয়াবান খোদার নিকট হতে, যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং তার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই [৬]।

৫। প্রতিদানের পর পূর্ণমাত্রায় পুরস্কারদানের উল্লেখের মর্ম হচ্ছে-এই লোকদেরকে কেবলমাত্র কৃতকর্মের অনুপাতে ফলদান করেই ক্ষান্ত হওয়া হবেনা, বরং তাদেরকে এর অতিরিক্ত পরিপূর্ণ মাত্রাতে পুরস্কার দান করা হবে।

৬। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের প্রতাপ এরূপ হবে যে, কি পৃথিবীবাসী আর কি আসমানবাসী কারো পক্ষেই নিজ হতে খোদার সম্মুখে মুখ খোলার কিংবা বিচার-কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু সাহস করা সম্ভব হবেনা।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ

যাকে (সে) ছাড়া | তারা কথা বলতে পারবে | না | সারিবদ্ধভাবে | ফেরেশতারা | ও | রূহ (জিবরাইল) | দাঁড়াবে | সেদিন

اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ

সত্য | দিন | সেই | যথাযথ | বলবে | এবং | দয়াময় | তার জন্যে | অনুমতি দেবেন

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا

আযাবের | তোমাদেরকে আমরা সতর্ক করছি | নিশ্চয় আমরা | প্রত্যাবর্তনের (পথ) | তার রবের | দিকে | গ্রহণ করুক (আজ) | চায় | অতএব যে

قَرِيْبًا ۖۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ

বলবে | এবং | তার দু'হাত | আগে পাঠিয়েছে | যা | মানুষ | দেখবে | সেদিন | নিকট

الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

মাটি | যদি আমি হতাম | আমার আফসোস হায় | কাফের

৩৮। যেদিন রূহ[৭] ও ফেরেশতা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ 'টু' শব্দ করবে না- সে ব্যতীত, যাকে পরম দয়াবান অনুমতি দিবেন এবং যে যথাযথ কথা বলবে।

৩৯। সে দিনটি সত্য- অনিবার্য। এখন যার ইচ্ছা নিজের খোদার নিকট প্রত্যাবর্তন করার পথ গ্রহণ করুক।

৪০। আমরা তোমাদেরকে খুব নিকটে উপস্থিত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি। যেদিন মানুষ সে সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে- সেদিন কাফের চীৎকার করে বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

৭। 'রূহ' বলতে জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা হওয়ার কারণে সাধারণ ফেরেশতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আন-নাযি'য়াত

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি সূরা আন-নাবার পরে নাযিল হয়েছে। সূরায় আলোচিত বিষয়ের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এটা প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

'কিয়ামত' ও মৃত্যুর পর জীবন প্রমাণ করাই এ সূরার বিষয়বস্তু। সে সংগে এতে আল্লাহর রসুলকে (সঃ) মিথ্যা মনে করে অমান্য করলে তার পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শুরুতে জান কব্জকারী আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, মৃত্যুর পর আর এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। এ দু'টো ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতা'র হাতে এখানে জান কব্জ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছুই নয় এবং সে ফেরেশতারাই সেদিন সেই আল্লাহর হুকুম মুতাবিকই সমগ্র সৃষ্টিলোকের বর্তমান শৃংখলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবেন এবং নতুনভাবে অপর একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু হবে না।

অতঃপর লোকদেরকে বলা হয়েছে, যে কাজকে তোমরা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে কর আল্লাহতাআলার পক্ষে তা করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এর জন্যে কোন বড় ও ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। একটা ধাক্কা বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। অতঃপর অপর একটা জগত পুনরায় সৃষ্টি হওয়া এবং তাতে সমস্ত মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠার জন্যে আর একটা ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এই পুনরুজ্জীবনকে অমান্য বা অবিশ্বাস করছে, সেদিন তারাই ভয়ে থর থর করে কাপতে থাকবে। ভীত -সন্ত্রস্ত চোখে তারা সেইসব কিছু অনুষ্ঠিত হতে দেখতে থাকবে যাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করছিল।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রসূলকে অমান্য ও অবিশ্বাস করার, তাঁর হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনে বাধা দান করার এবং হীন কৌশলের সাহায্যে তাকে পরাজিত করার চেষ্টা করার পরিণামে ফিরাউন অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তা হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরূপ চাল-চলন হতে বিরত না থাকলে তোমাদেরকে অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে নিঃসন্দেহে।

২৭-৩৩ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে পরকাল ও মৃত্যুর পর জীবন হওয়ার স্বপক্ষে দলীল ও প্রমাণ পেশ করা

হয়েছে। এ প্রসংগে প্রথমত অমান্যকারী ও অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, তোমরাই বল, তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন কাজ কিংবা, মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এই বিরাট বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এই কাজটি করা কঠিন ছিল না তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? পরকাল হবার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্যে এই অকাট্য যুক্তি একটি বাক্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানের প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা অতীব উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এদিকে ইংগিত করে একটা অতি বড় প্রশ্ন মানুষের বিবেকের নিকট রাখা হয়েছে। তা হলো এই যে, বিরাট-বিশাল বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি সংগত মনে হয়, না পৃথিবীতে বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরকালের জন্যে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোন হিসাব নিকাশ না নেয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসংগত মনে হয়? এ প্রশ্নটা নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। তার পরিবর্তে ৩৪-৪১ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে হাশরের দিন সমস্ত মানুষের চিরন্তন ও চিরকালীন ভবিষ্যতের ফয়সালা করা হবে। দুনিয়ার কোন লোক দাসত্বসীমা অতিক্রম করে আল্লাহদ্রোহীতা করেছে, বৈষয়িক স্বার্থ ও সুখ-সুবিধাকে একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, আর কে আল্লাহর সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্যে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়াকে ভয় করেছে এবং নফসের অবৈধ খাহেশকে পূরণ করতে অস্বীকার করেছে, এ প্রশ্নই হবে সেদিনকার এ ভবিষ্যত ফয়সালার একমাত্র মানদন্ড। বস্তুত যে লোক জিদ্‌ ও হঠকারিতা হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এ বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করে সেইই উপরোক্ত প্রশ্নের নির্ভুল জবাব অতি সহজে লাভ করতে পারে। কেননা, দুনিয়ার মানুষকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভিত্তিক ও নৈতিক দাবীই হল এই যে, শেষ পর্যন্ত এরই ভিত্তিতে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে ও তদানুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

শেষাংশে মক্কার কাফিরদের একটা প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন ছিল, যে কিয়ামতের কথা এত জোরের সাথে বলা হচ্ছে তা কবে হবে-কবে আসবে সেই কিয়ামতের দিন? নবী করীমের (সঃ) কাছে এ প্রশ্ন তারা বারবার পেশ করতো। এর জবাবে বলা হয়েছে, ঠিক কোন মুহূর্তে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, আর কেউই বলতে সক্ষম নয়। রসূলের দায়িত্ব শুধু এই যে, তিনি তার নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ আগমন সম্পর্কে লোকদের শুধু সতর্ক ও সাবধান করে দেবেন। এখন যার ইচ্ছা তার আগমনকে ভয় করে নিজের নীতি ও আচরণকে সঠিক করে নেবে। আর যার ইচ্ছা নির্ভীক হয়ে লাগামছাড়া ঘোড়ার ন্যায় জীবন পরিচালিত করবে। কিন্তু আজ যারা এ দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু ও সর্বশেষ মনে করছে, কিয়ামত যখন হবে তখন তারাই মনে করবে যে, দুনিয়ায় তো তারা খুব অল্প সময়ই বসবাস করেছে, তার অধিক নয়। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্যে তারা তাদের চিরকালীন ভবিষ্যতকে কিভাবে চূড়ান্তভাবে বরবাদ করেছে, বরবাদ করে কিই না নির্বুদ্ধিতা করেছে, তা সেদিন তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে।

দুই তার রুকু   মক্কী নাযিআত সূরা   ছচল্লিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ① وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ② وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ③

শপথ (ফেরেশতাদের) সজোরে (প্রাণ) নির্গতকারী (যারা নির্গত করে) ডুবে শপথ (ফেরেশতাদের) (আত্মার) বাধন উন্মুক্তকারী (যারা মৃদভাবে) করে)উন্মুক্ত শপথ (ফেরেশতাদের) সাঁতারকারী (যারা তীব্র গতিতে) সাঁতরায়

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ④ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥

অতঃপর (শপথ) অগ্রগামী (ফেরেশতাদের) (যারা ক্ষিপ্র) অগ্রগমনে অতঃপর(শপথ) কার্যনির্বাহী (ফেরেশতাদের) (যারা পরিচালনা করে) কর্ম সেদিন প্রকম্পিতকরবে (শিংগার ফুকের) তীব্র প্রকম্পন

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ⑧

তার অনুসরণ করবে (আরো একটি) প্রকম্পন অনুগামী (কতিপয়) দিল সেদিন সন্ত্রস্ত (হবে)

সূরা আন-নাযি'আত

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত : ৪৬ মোট রুকু : ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা ডুবে টানে,
২। এবং খুব সহজভাবে বের করে নিয়ে যায় [১];
৩। এবং সেই (ফেরশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) তীব্র গতিতে সাঁতার কেটে চলে [২]।
৪। (হুকুম পালনে) ক্ষিপ্রতা গ্রহণ করে [৩];
৫। এবং (খোদায়ী বিধান অনুযায়ী) যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা পরিচালনা করে ৪।
৬। যে দিন কম্পনের ধাক্কা হেলিয়ে দেবে,
৭। তার পর পরই আসবে আর একটি ধাক্কা
৮। কতিপয় দিল সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে,

১। এখানে সেই ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে যারা মৃত্যুর সময় দেহের গভীরে পৌছে প্রতিটি ধমনী থেকে মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করে বাহির করে।
২। অর্থাৎ খোদার হুকুম পালনে তারা এমন দ্রুত, গতিশীল ও তড়িৎ কর্মতৎপর যে, মনে হয় তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।
৩। ক্ষিপ্রতায় অগ্রগামী-অর্থাৎ খোদার ইংগিত পাওয়া মাত্রই তাদের প্রত্যেকই তা পালনের জন্য তীব্র গতিশীলতা অবলম্বন করে।
৪। এঁরা সৃষ্টি-রাজ্যের কর্মচারী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁদেরই হাতে সুসম্পন্ন হচ্ছে।

أَبْصَارُهَا	خَاشِعَةٌ ⑨	يَقُولُونَ	أَإِنَّا	لَمَرْدُودُونَ	فِي
তার দৃষ্টিসমূহ	ভীতসন্ত্রস্ত (হবে)	তারা বলে	অবশ্যই কি আমরা	অবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী হবো	মধ্যে

الْحَافِرَةِ ⑩	أَإِذَا	كُنَّا	عِظَامًا	نَخِرَةً ⑪	قَالُوا	تِلْكَ	إِذًا
পূর্বাবস্থার	যখন কি	আমরা হবো (পরিনত)	অস্থিসমূহে	গলিত	তারা বলল	এটা	তা হলে

كَرَّةٌ	خَاسِرَةٌ ⑫	فَإِنَّمَا	هِيَ	زَجْرَةٌ	وَاحِدَةٌ ⑬	فَإِذَا	هُمْ	بِالسَّاهِرَةِ ⑭
প্রত্যাবর্তন	বড়ই ক্ষতিকর (হবে)	প্রকৃতপক্ষে	তা	মহাশব্দ	একটি মাত্র	অতঃপর তখনই	তারা	ময়দানে (হবে) খোলা

هَلْ	أَتَاكَ	حَدِيثُ	مُوسَى ⑮	إِذْ	نَادَاهُ
কি	তোমার কাছে এসেছে	বৃত্তান্ত	মূসার	যখন	তাকে ডেকেছিলেন

رَبُّهُ	بِالْوَادِ	الْمُقَدَّسِ	طُوًى ⑯	اذْهَبْ	إِلَى	فِرْعَوْنَ
তার রব	উপত্যকায়	পবিত্র	তুয়ার	(আল্লাহ বললেন তাকে) যাও	নিকট	ফিরআউনের

إِنَّهُ	طَغَى ⑰	فَقُلْ	هَلْ	لَكَ	إِلَى	أَنْ	تَزَكَّى ⑱
সে নিশ্চয়	বিদ্রোহ করেছে	অতঃপর বল	(আছে) কি	তোমার (আগ্রহ)	(এর) প্রতি	যে	তুমি পবিত্র হবে

৯। তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।
১০। এই লোকেরা বলেঃ আমাদেরকে কি সত্যই পুনরায় ফিরিয়ে আনা হবে?
১১। আমরা যখন পচা-গলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হব (তখন)?
১২। বলতে লাগল, এই প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে [৫]।
১৩। অথচ এ তো এতটুকু মাত্র কাজ যে, একটি প্রবল আকারের হুমকি পড়বে।
১৪। এবং সহসাই তারা উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হয়ে পড়বে।
১৫। তোমাদের নিকট মূসা'র ঘটনার খবর পৌছেছে কি?
১৬। তার রব যখন তাকে তুয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিল।
১৭। ফিরআউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছে।
১৮। এবং তাকে জিজ্ঞেস করঃ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত?

৫। অর্থাৎ যখন তাদের জবাব দেওয়া হলো যে হ্যাঁ এইরূপই হবে। তখন তারা বিদ্রুপ করে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো: দোস্ত! বাস্তবিক যদি আমাদের ফিরে দ্বিতীয়বার বেঁচে উঠতে হয়, তবে তো আমরা মরেছি!!

وَ اَهۡدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الۡاٰيَةَ الۡكُبۡرٰى ﴿٢٠﴾

এবং | তোমাকে আমি পথ দেখাবো | দিকে | তোমার রবের | তুমি যেন ভয় কর | তাকে অতঃপর সে দেখালো | একটি নিদর্শন | বড়

فَكَذَّبَ وَ عَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ

সে কিন্তু মিথ্যারোপ করলো | এবং | অবাধ্য হলো | এর পরে | পিঠ ফিরালো | (প্রতিকারে) সচেষ্ট হল | পরে সমবেত করল

فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ

আর ঘোষণা করলো | অতঃপর বলল | আমি | তোমাদের রব | সর্বশ্রেষ্ঠ | তখন তাকে ধরলেন | আল্লাহ | শাস্তি (দিয়ে)

الۡاٰخِرَةِ وَ الۡاُوۡلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى ﴿٢٦﴾

আখেরাতের | ও | দুনিয়ার | নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই শিক্ষা | তার জন্যে যে | ভয় করে

ءَاَنۡتُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾

তোমরা কি | কঠিনতর | সৃষ্টি | অথবা | আকাশ | তা তিনি নির্মাণ করেছেন

১৯। এবং আমি কি তোমাকে তোমার খোদার দিকে পথদেখাবো, যেন (উহার ফলে) তুমি তাকে ভয় করতে থাক?

২০। পরে মূসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখাল৬।

২১। কিন্তু সে অবিশ্বাস ও অমান্য করল।

২২। পরে চালবাজি করার মতলবে পিছনে ফিরে গেল।

২৩-২৪। এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললঃ আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।

২৫। শেষকালে আল্লাহ তাকে পরকাল ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন।

২৬। বস্তুত এমন প্রত্যেক লোকের জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে যারা ভয় করে৭।

২৭। তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক শক্ত ও কঠিন কাজ, কিংবা আসমান সৃষ্টি? আল্লাহই তো তা নির্মাণ করেছেন।

৬। 'বড় নিদর্শন অর্থ' -লাঠির অজগররূপ ধারণ করা। পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে এর উল্লেখ আছে।

৭। অর্থাৎ খোদার রসূলকে (সঃ) অমান্য ও অস্বীকার করার সেই পরিণতিকে ভয় করে যে পরিণতির সম্মুখীন ফিরাউন হয়েছিল।

রুকু ঃ ২

২৮। তার ছাদ যথেষ্ট উচ্চে তুলেছেন, পরে তার সমতা স্থাপন করেছেন।
২৯। এবং তার রাত্র আচ্ছন্ন করেছেন, তার দিন প্রকাশ করেছেন।
৩০। অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।
৩১। তার ভিতর হতে উহার পানি ও উদ্ভিদ, খাদ্য বের করেছেন।
৩২-৩৩। আর তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন জীবিকার সামগ্রীরূপে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।
৩৪। অতএব যখন সেই মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে[৮]।
৩৫। যেদিন মানুষ তার সব কৃতকর্ম স্মরণ করবে।
৩৬। এবং দৃষ্টিমানের সামনে দোযখ উন্মুক্ত করে রাখা হবে।
৩৭। তখন যে লোক (দুনিয়ায়) খোদাদ্রোহিতা করেছিল।

৮। অর্থাৎ কিয়ামত।

وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ

যে | আর (তার) ব্যাপার | (তার) বাস স্থান | তাই | দোযখই (হবে) | অতঃপর নিশ্চয় | দুনিয়ার | জীবনকে | অগ্রাধিকার দিয়েছে | এবং

خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ

অতঃপর নিশ্চয় | খারাপ কামনা | হতে | প্রবৃত্তিকে | বিরত রেখেছে | এবং | তার রবের সম্মুখে | দাঁড়াতে | ভয় করেছে

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ

সে ব্যাপারে | তা ঘটবে | কখন | কিয়ামত | সম্পর্কে | তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা | (তার) বাসস্থান | তাই | জান্নাত (হবে)

اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ

যে | সতর্ককারী (মাত্র) | তুমি | শুধুমাত্র | তার চূড়ান্ত (জ্ঞান) | তোমার রবের | নিকট | তার উল্লেখ করা | তোমার (দায়িত্ব নয়)

يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

তার এক সকাল | অথবা | এক সন্ধ্যা | এছাড়া | তারা অবস্থান করে নাই | তা দেখবে (মনে করবে) | যে দিন | তারা যেন | তা ভয় করে

৩৮। এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

৩৯। এই দোযখই হবে তার পরিণাম।

৪০। আর যে লোক নিজের খোদার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রেখেছিল।

৪১। জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

৪২। এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, সেই ক্ষণটি কখন এসে পৌছবে?

৪৩। তার নির্দিষ্ট সময় বলা তো তোমার কাজ নয়,

৪৪। তার সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ পর্যন্তই শেষ।

৪৫। তুমিতো শুধু সাবধানকারী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে উহার ভয় করে।

৪৬। যেদিন এ লোকেরা তা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে, (এ দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) শুধু একদিনের বিকেল কিংবা সকাল বেলাই তারা অবস্থান করেছে মাত্র।

সূরা 'আবাসা'

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তফসীরকার ও হাদীসবিদ্ সকলেই একমত হ'য়ে এর নাযিল হওয়ার যে কারণ ও উপলক্ষের উল্লেখ করেছেন তা এই যে, একবার নবী করীমের (সঃ) দরবারে মক্কার কিছু বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম (সঃ) তাদেরকে ইসলাম কবুল করবার আহবান দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ইব্‌নে উম্মে মকতুম নামক একজন অন্ধ নবী করীমের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীমের নিকট ইস্‌লাম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময় তাঁর বাক্যালাপ চালু রাখার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় নবী করীম (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এ প্রসংগেই আল্লাহর তরফ হতে এই সূরা নাযিল হয়। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এ ঘটনার দৃষ্টিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে উম্মে মক্‌তুম নবী করীমের (সঃ) নিকট সেই প্রাথমিক পর্যায়েই ইস্‌লাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। হাফেয ইবনে হাজার৹ হাফেয ইবনে কাসীর প্রমূখ তফ্‌সীরকারদ্বয় স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন اسلم بمكة قديما তিনি মক্কায় প্রাচীন কালেই ইসলাম কবুল করেছিলেন' এবং هو من اسلم قديما 'তিনি প্রাচীন কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ('প্রাচীন কালের' অর্থ একেবারে শুরুতে)।'

দ্বিতীয়ত ঃ হাদীসের যে- সব বর্ণনায় এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কোন-কোনটি হতে জানতে পারা যায় যে, যে সময় এ ঘটনাটি ঘটে তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোনটি হতে জানা যায় যে এ সময় তিনি ইসলা-মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মাত্র এবং সত্যের সন্ধানেই তিনি রসূলে করীমের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এসে বলেছিলেনঃ يا رسول الله ارشدنى 'ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, ইবনে জরীর, আবু ইয়ালা)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ তিনি (ইবনে উম্মে মক্‌তুম) এসে কুরআনের একটি 'আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

বলেছিলেনঃ يا رسول الله علمنى مما علمك الله ইয়া রাসূলুল্লাহ 'আল্লাহআপনাকে যে ইলম দিয়েছেন, তা আমাকে শিক্ষা দিন' (ইব্‌নে জারীর ইব্‌নে আবু হাতেম)। এসব বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সময় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম মেনে নিয়েছিলেন। এ হ'ল একটা দিক অপর দিকে যে সব বর্ণনা রয়েছে, তা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় তাঁর মনে সত্য সন্ধানের গভীর বাসনা ও আবেগ জেগেছিল। তিনি নবী করীমকে হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর সেই বাসনা ও আবেগ চরিতার্থ করা-ই ছিল সেখানে আগমনের ও কিছু প্রশ্ন করার মূলে তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাহ্যিক অবস্থা হতেও বুঝা যাচ্ছিল যে, তাঁকে হেদায়াত দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন ও উপকৃত হতেন। সূরার ৩ নং আয়াত لعله يزكى এর অর্থ ইবনে যায়দ বলেছেন لعله يسلم সম্ভবতঃ সে ইসলাম গ্রহণ করতো (ইবনে জারীর)। খোদার নিজের কালামও তাইঃ তুমি কি জান, সম্ভবতঃ সে ঠিক হয়ে যেত; কিংবা নসীহতের প্রতি মনোযোগ দিত এবং উপদেশ দান তার জন্যে কল্যাণকর হ'ত। এবং যে লোক তোমার নিকট নিজেই দৌড়ে আসে এবং যে ভয়ও পোষণ করে তার প্রতি তুমি অমনোযোগিতা দেখাও'। এসব-ই এই দ্বিতীয় কথার সমর্থক।

তৃতীয়তঃ নবী করীমের দরবারে এই সময় যারা বসেছিল, হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় তাদের নামের উল্লেখ হয়েছে। উতবা, শাইবা, আবুজেহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ, উবাই ইবনে খালফ প্রভৃতি ইসলামের বড় বড় দুশমনের নাম এ তালিকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ হতে জানা যায়, এঘটনা সে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন এ লোকদের সাথে নবী করীমের

মেলামেশা চালু ছিল, তখনও তাদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা এতখানি বৃদ্ধি পায়নি যার দরুন তাঁর নিকট এ লোকদের যাতায়াত ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সব ব্যাপার হতেই প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি প্রাথমিক অবতীর্ণ সূরা সমুহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

বাহ্যতঃ শুরু করার ভংগি দেখে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় মাতব্বর-সরদার লোকদের প্রতি সাগ্রহ বেশী গুরুত্ব প্রদর্শন করায় এ সূরায় নবী করীমের প্রতি শাসন, তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সূরাটি সম্পর্কে সম্যক ও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সরদারদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং সত্যবিমুখতার কারণে নবী করীমের দ্বীনি দাওআত প্রচারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। আর সেই সংগে নবী করীমকে দ্বীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তিনি নবুয়্যতের কাজ সম্পাদনের শুরুতে যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তির প্রতি কম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংগে কুরাইশ সরদারদের প্রতি দেখিয়েছিলেন অনেক বেশী আগ্রহ ও ব্যাগ্রতা কিন্তু তা এজন্য ছিল না যে, তিনি বুঝি বড় লোকদের সম্মানের প্রতি ও অন্ধকে ঘৃণার পাত্র হীন-নগন্য মনে করতেন, আর তাঁর মধ্যে বুঝি নৈতিক বক্রতা পাওয়া যেত, যার দরুন আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। না, ব্যাপার মূলত'ই তা ছিল না, ব্যাপারটির মূল রূপ ছিল ভিন্নতর। বস্তুতঃ কোন মতাদর্শ প্রচারক যখন তার প্রচার কার্য শুরু করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্য আরোপিত হয় এদিকে যে সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা তা কবুল করুক, যেন প্রচারকার্য সহজতর হয়। নতুবা সাধারণ, প্রভাব-কর্তৃত্বহীন, অক্ষম ও দুর্বল লোকেরা যদি সে আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণও করে এবং তা ব্যাপকতাও লাভ করে তবু তাতে মূল ব্যাপারে কোন বড় রকমের পার্থক্যই সুচিত হয় না। নবী করীম(সঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় এ মনোভাব ও এ কর্মনীতি-ই গ্রহণ করেছিলেন। আর এর মূলে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দ্বীনি দা'ওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতা-ই ছিল একমাত্র কারণ। বড় লোকদের সম্মান ও ছোট লোকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ কখনো লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা নবী করীম (সঃ)-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের এ নির্ভূল ও সঠিক পন্থা নয়। বরং ইসলামী আদর্শ ও দাওআতের দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যতই দুর্বল প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন, দ্বীনি আন্দোলনের দৃষ্টিতে সে একেবারেই গুরুত্বহীন। এ কারণে বলা হ'ল যে ইসলামী আদর্শ আপনি যত লোককে শুনান - না, কেন, আপনার নিকট আসল লক্ষ্য ও আগ্রহ পাওয়ার অধিকারী তো সেই সব লোক, যাদের মনে সত্য আদর্শ গ্রহণের আগ্রহ ও মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে। পরন্তু যে সব অহংকারী দাম্ভিক লোক, আত্মম্ভরিতার দরুন মনে করে যে আপনি তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী, আপনার প্রতি তাদের কোন মুখাপেক্ষিতা নেই, কেবল তাদের সম্মুখেই এ দ্বীনী আদর্শের দাওআত পেশ করতে থাকা এর উচ্চ ও মহান মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর।

শুরু থেকে ১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলোই বলা হয়েছে। অতঃপর ১৭ নম্বর আয়াত হতে সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা নবী করীমের দ্বীনী দাওআতকে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, রেয্‌কদাতা ও প্রতিপালক খোদার প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল, তার প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

رُكُوۡعُهَا ١ (٨٠) سُوۡرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٤٢

এক তার রুকু   মক্কী আবাসা সূরা   বিয়াল্লিশ তার আয়াত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ﴿١﴾ اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّهٗ

সে হয়তো তোমাকে জানাবে কিসে এবং একঅন্ধ তার (কাছে) এসেছে (এজন্যে) যে (মুখ ফিরালো) অনাগ্রহ দেখালো ও (ভ্রুকুঞ্চিত করল) বেজার মুখ হল

يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾ اَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكۡرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰى ﴿٥﴾

বেপরোয়া হল (উন্নাসিকা দেখাল) যে (তার) ব্যাপারে উপদেশ তাকে উপকার দিত অতঃপর উপদেশ গ্রহণ করতো বা পরিশুদ্ধ হতো

فَاَنۡتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيۡكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنۡ

যে আর (তার) ব্যাপার সে পরিশুদ্ধ হয় যদি না তোমার উপর (দায়িত্ব) নাই কিন্তু মনযোগ দিচ্ছো তার জন্যে তুমি অথচ

جَآءَكَ يَسۡعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخۡشٰى ﴿٩﴾

ভয় করে সে এবং দৌড়ে তোমার কাছে আসে

সুরা আবাসা [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৪২ মোট রুকু ঃ ১

দয়বান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। বেজার মুখ হল ও অনাগ্রহ দেখাল
২। এ জন্য যে, সে অন্ধ ব্যক্তি তাহার নিকট এসেছে [১]
৩। তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,
৪। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হত?
৫। যে লোক উন্নাসিকতা দেখায়
৬। তার প্রতি তো তুমি লক্ষ্য দিতেছ ;
৭। অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তোমার উপর এর -দায়িত্ব নাই
৮। আর যে লোক তোমার নিকট দৌড়ে আসে
৯। এবং সে ভয় করে ,

১। পরবর্তী বাক্য সমূহ থেকে জানা যায় বেজার মুখ হওয়া ও অনাগ্রহ প্রদর্শনের এ কাজটি স্বয়ং নবী করীমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে যে অন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ),হযরত খাদীজার (রাঃ) ফুফাতো ভাই । মক্কার বড় বড় কাফের সর্দারদের প্রতি নবী করীম (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিতে রত ছিলেন , (এমন সময় এই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চান।) ঠিক এই সময় কথায় বাধাদান করায় নবী (সঃ) এর বিরক্তি সৃষ্টি হয়।

১০। তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছ।
১১। কক্ষণও নয় ২। এ তো এক উপদেশ।
১২। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে।
১৩। তা এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ, যা সম্মানিত,
১৪। উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন পবিত্র৩।
১৫-১৬। তা সুসম্মানিত ও নেককার লেখকদের হাতে থাকে ৪।
১৭। অভিশাপ ৫ বর্ষিত হোক এ মানুষদের উপর; এরা কতই না সত্য-অমান্যকারী।
১৮। আল্লাহ্ এ মানুষকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?
১৯। শুক্রের একটি ফোটা দিয়ে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার নিয়তি নির্দিষ্ট করেছেন,
২০। পরে তার জন্য জীবনের পথ সহজ বানিয়ে দিয়েছেন।

২। অর্থাৎ কখনও এরূপ করবে না। যারা খোদাকে ভুলে আছে ও নিজেদের পার্থিব মান-মর্যাদায় ফুলে আছে সেই লোকদের প্রতি অসংগত গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা এমন মূল্যহীন জিনিস নয় যে যারা তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তাদের সামনে অনুনয় বিনয় সহকারে তা পেশ করতে হবে। তাছাড়া এই অহংকারী লোকদের ইসলামের দিকে আনার জন্যে এমন ভংগী গ্রহণ করা- এমনভাবে চেষ্টা করা তোমার মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয় যাতে এই লোকেরা মনে করবে যে - তোমার কোন স্বার্থ এদের কাছে আটকা পড়ে আছে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে তোমার দাওয়াত উৎকর্ষ লাভ করবে ; না হ'লে তা ব্যর্থ হবে। সত্য তাদের থেকে ততটাই বেপরওয়া যতটা বেপরওয়া তারা সত্যের প্রতি।

৩। অর্থাৎ সব রকমের ভেজাল ও মিশাল হতে মুক্ত ও পবিত্র। এতে বিশুদ্ধ সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন প্রকারের বাতিল এবং নষ্ট ও ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাস বা মতাদর্শ এর মধ্যে অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র অবকাশ পায়নি।

৪। এখানে সেই ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের লিপিসমূহ আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি হেদায়েত অনুযায়ী লিখছিলেন, সেগুলির সংরক্ষণ ও হেফাযত করছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত সেগুলিকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

৫। এখান থেকে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল। এর পূর্বে সূরার শুরু থেকে ১৬নং আয়াত পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) কে সম্বোধন ও উপলক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে। এবং কাফেরদের প্রতি পরোক্ষ ভাবে রোষ-অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছিল। এর বাচনভংগী ছিল এরূপঃ হে নবী! সত্যের সন্ধানকারী ব্যক্তির পরিবর্তে তুমি এ কোন সব লোকদের প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করছো? সত্য দ্বীনের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদেরতো কোনই মূল্য ও গুরুত্ব নেই। আর তোমার মত মহা সম্মানিত নবী কুরআনের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন গ্রন্থকে তাদের সামনে যে পেশ করবে এরও যোগ্য তারা নয়।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا

এরপর | তাকে মৃত্যু দেন | তাকে অতঃপর কবরস্থ করেন | এরপর | যখন | চাইবেন | তাকে পুনরায় জীবিত করবেন | কক্ষণ না | না যা

يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٤ اَنَّا صَبَبْنَا

সে সম্পাদন করেছে | যা | তাকে আদেশ করেছেন তিনি | অতঃপর লক্ষ্য করুক | মানুষ | প্রতি | তার খাদ্যের | নিশ্চয় আমরা | আমরা বর্ষণ করেছি

الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝٢٦ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٧

পানি | (প্রচুর) বর্ষণ | এরপর | আমরা বিদীর্ণ করেছি | মাটিকে | (খুব) বিদীর্ণ | অতঃপর আমরা উৎপন্ন করেছি | তার মধ্যে | শস্য

وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا ۝٢٨ وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا ۝٢٩ وَّ حَدَآئِقَ

ও | আংগুর | ও | শাকসবজি | এবং | যয়তুন | ও | খেজুর | এবং | বাগিচাসমূহ

غُلْبًا ۝٣٠ وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ۝٣١ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٢

ঘন সন্নিবেশিত | এবং | ফল | ও | উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য | ভোগ্য সামগ্রী (রূপে) | তোমাদের জন্যে | ও | তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝٣٤ وَ

অতঃপর যখন | আসবে | কর্ণবিদারক ধ্বনি | সে দিন | পালাবে | মানুষ | হতে | তার ভাই | ও

২১। তার পর তাকে মৃত্যু দিলেন ও কবরে পৌঁছবার ব্যবস্থা করলেন।

২২। শেষে যখন চাইবেন তিনি তাকে পুনরায় উঠিয়ে দাঁড় করে দিবেন।

২৩। কক্ষণও নয়, সে সেকর্তব্য পালন করে নাই যার নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।

২৪। তা ছাড়া মানুষ খানিকটা তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক।

২৫। আমরা প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।

২৬। এদিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি।

২৭-৩১। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরি-তরকারী, যয়তুন, খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা, আর রকম-বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ-খাদ্য।

৩২। তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জীবিকার সামগ্রীরূপে।

৩৩-৩৬। সবশেষে যখন সেই কান-বধিরকারী-ধ্বনি উচ্চারিত হবে[৬] সেদিন মানুষ নিজের ভাই,

---

৬। এহলো সর্বশেষ বারের শিংগায় ফুৎকারজনিত ভয়াবহ আওয়াজ। এই শব্দধ্বনিত হওয়ার সংগে সংগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, মৃত সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

أُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

তার মা | ও | তার বাপ (হতে) | ও | তার স্ত্রী | এবং | তার সন্তানদের (হতে) | জন্যে প্রত্যেক | ব্যক্তির | তাদের মধ্যকার

يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ

সেদিন | (বিশেষ) অবস্থা | তাকে ব্যতিব্যস্ত করবে | (অনেক) মুখ | সেদিন | উজ্জ্বল (হবে) | সহাস্য

مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا

প্রফুল্ল (হবে) | এবং | (অনেক) মুখ | সেদিন | তার উপর | মলিনতা (আসবে) | তাকে আচ্ছন্ন করবে

قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

অন্ধকার | ঐ সব লোক | তারাই (যারা) | কাফের | পাপী

নিজের মা, নিজের পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে।

৩৭। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় আসবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য থাকার মত অবস্থা থাকবে না।

৩৮-৩৯। সেদিন কিছু কিছু চেহারা ঝকমক্ করতে থাকবে, হাসিখুশিভরা ও সন্তুষ্ট স্বচ্ছন্দ হবে।

৪০। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধুলি মলিন হবে,

৪১। অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করবে।

৪২। আর এরাই হল কাফের ও পাপী লোক।

সূরা আত-তাকবীর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের كورت শব্দ হতে تكوير গ্রহণ করে তাকেই নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর كورت শব্দের অর্থ 'গুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে -পেচানো হইয়াছে।' একে নামরূপে গ্রহণ করার তাৎপর্য হলো এ এমন সূরা যাতে পেচানোর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভংগি দেখে স্পষ্ট মনে হয়, এটা মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটা।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় দু'টি বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। একটি হলো পরকাল এবং অপরটি হলো রেসালাত। প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য রশ্মিহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা ছিন্ন-ভিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে শুরু করবে, আপনার এবং প্রিয়তম জিনিসগুলোর প্রতিও লোকদের লক্ষ্য থাকবে না। বন-জংগলের জন্তু-জানোয়ার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এক স্থানে একত্রিত হয়ে যাবে, সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় সব রূহ নুতন করে দেহের মধ্যে স্থান পাবে, আমলনামা খোলা হবে , অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশমন্ডলের সমস্ত আড়াল-আবডাল দূর করা হবে এবং বেহেশ্‌ত-দোজখ সব জিনিসই চোখের সমুখে উদ্‌ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। পরকালের এ চিত্র অংকনের পর মানুষকে চিন্তা করার আহবান জানান হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি সম্বল নিয়ে এসেছে।

এরপর 'রেসালাত' বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। এই পর্যায়ে মক্কাবাসীদের বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের সমুখে যা পেশ করছেন, তা কোন পাগলের প্রলাপোক্তি নয়; নয় কোন শয়তানের প্রতারণাপ্রসূত কথা; বরং এ আল্লাহ প্রেরিত এক মহান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশ্বস্ত পয়গাম বাহকের বর্ণনা বিশেষ। মুহাম্মদ (সঃ) উন্মুক্ত আকাশের দূরদিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোকে নিজ চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছেন, এই মহান ও নির্ভুল আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?

এক তার রুকু মক্কী তাকবীর, সূরা উনত্রিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

চালানো হবে পর্বতমালা যখন এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে তারকাগুলো যখন এবং গুটানো হবে সূর্য যখন

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ

সমুদ্র যখন এবং একত্রিত করা হবে বন্য পশুদের যখন ও উপেক্ষিত হবে পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রী যখন এবং

سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨

জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন এবং জুড়ে দেয়া হবে (শরীরের সাথে) আত্মাসমূহকে যখন এবং প্রজ্বলিত করা হবে

সূরা আত তাকবীর

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ২৯, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরেমান আল্লাহর নামে

১। যখন সূর্য গুটিয়ে দেয়া হবে [১]

২। যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে-পড়বে

৩। যখন পর্বতসমূহ চলমান করে দেয়া হবে,

৪। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে [২],

৫। আর যখন সব জন্তু-জানোয়ার চারদিক হতে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে,

৬। এবং সমূদ্র যখন প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

৭। আর যখন প্রাণগুলোকে (শরীরের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে [৩],

৮।যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে যে

১। অর্থাৎ সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যে আলোক রশ্মি দুনিয়াতে বিস্তৃত হয় তা সূর্যতে গুটিয়ে দেয়া হবে ও তার বিস্তীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

২। আরববাসীদের কাছে আসন্ন প্রসবা উটনী থেকে অধিকতর মূল্যবান সম্পদ আর কিছু ছিল না। এই প্রকার উটনীর খুব বেশী হেফাযত ও দেখাশুনা করা হতো। এরূপ উষ্ট্রী থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ - সে সময় মানুষের উপর এরূপ কঠিন বিপদ আপতিত হবে যে নিজেদের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণের খেয়াল ও চেতনা পর্যন্ত তাদের থাকবে না।

৩। অর্থাৎ মানুষকে নতুন করে সেইভাবে জীবিত করা হবে দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বে দেহ ও আত্মাসহ যেরূপ সে জীবিত ছিল।

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَ اِذَا السَّمَآءُ

আকাশ যখন এবং উন্মোচিত হবে আমলনামা যখন এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে গুনাহের কোন কারণে

كُشِطَتْ ۝١١ وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ

জানবে নিকটে আনা হবে জান্নাত যখন এবং প্রজ্জ্বলিত করা হবে জাহান্নাম যখন এবং আবরণ অপসারিত হবে

نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦

অদৃশ্যমান (নক্ষত্রগুলোর) চলমান পশ্চাদপসরণকারী আমি শপথ করছি অতঃপর না উপস্থিত করেছে যা (প্রত্যেক) ব্যক্তি

وَ الَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ

বার্তা বাহকের অবশ্যই বানী নিশ্চয়ই তা শ্বাস নেয় যখন প্রভাতের ও বিদায় নেয় যখন রাতের এবং

كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١

(এবং সে) বিশ্বস্ত সেখানে মান্যকরা হয় মর্যাদাশালী আরশের মালিকের কাছে শক্তি সম্পন্ন সম্মানিত

৯। সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল?

১০। আর যখন আমলনামা সমূহ উম্মূক্ত হবে,

১১। যখন আকাশ মন্ডলের অন্তরাল দূরীভূত হবে,

১২। যখন জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত হবে,

১৩। আর যখন জান্নাত নিকটে আনা হবে,

১৪। তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১৫-১৬। পরন্তু নয় [৪], আমি শপথ করে বলছি আবর্তনশীল ও লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রসমূহের,

১৭। আর রাত্রির, যখন তা বিদায় নিল,

১৮। আর প্রভাতকালের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করল।

১৯। তা মূলত এক সম্মানিত পয়গাম বাহকের উক্তি। [৫]

২০। যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

২১। সেখানে তার আদেশ মান্য করা হয় [৬] তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত;

৪। কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা যাচ্ছে তা কোন পাগলের প্রলাপ অথবা কোন শয়তানী প্রতারণামূলক উক্তি- তোমাদের এ ধারনা ও অনুমান ঠিক নয়।

৫। এখানে মহান পয়গম্বর (রসূলিন করীম) অর্থ-অহী আনয়নকারী ফেরেশতা; এর পূর্বের আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। কুরআনকে পয়গামবাহকের উক্তি বলার অর্থ এই নয় যে, এটা সেই ফেরেশতার নিজস্ব কালাম। 'পয়গামবাহকের উক্তি' এই শব্দ ক'টি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এটা সেই মহান সত্তার বাণী যিনি ফেরেশতাকে পয়গাম-বাহকরূপে পাঠিয়েছেন।

৬। অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের নেতা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নেতৃত্বাধীনে কাজ করেন।

وَ مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

এবং না তোমাদের সাথী পাগল এবং নিশ্চয় সে তাকে দেখেছে দিগন্তে সুস্পষ্ট

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

এবং না সে ব্যাপারে গায়েবের কৃপণ এবং না তা উক্তি শয়তানের অভিশপ্ত

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ

অতএব কোথায় চলেছ তোমরা নয় তা এ ছাড়া উপদেশ বিশ্ব জগতের জন্যে তার জন্যে যে চায়

مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে এবং না (যা) তোমরা চাও (তা কিছু হয়) এ ছাড়া যা চান আল্লাহ

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

রব জগতসমূহের

২২। এবং (হে মক্কাবাসী) তোমাদের সঙ্গী পাগল নয়[৭]

২৩। সে সেই পয়গামবাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে।

২৪। আর সে গায়েবের (এই জ্ঞানকে লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাবার) ব্যাপারে কৃপণ নয়।

২৫। তা কোন অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয়।

২৬। এতদ্সত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ?

২৭-২৮। তা তো সমগ্র জগতবাসীর জন্য একটি উপদেশ,তোমাদের মধ্য হতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য - যে নির্ভুল পথে চলতে চায়।

২৯। আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না - যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান।

৭। সংগী বলতে রসূল করীমকে (সঃ) বুঝানো হয়েছে।

সূরা আল ইনফিতার

নামকরণ

প্রথম আয়াতের انفطرت শব্দ হতে নাম গৃহীত হয়েছে; 'ইনফিতার' শব্দের অর্থ হলো দীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। এরূপ নামের তাৎপর্য এই যে, এটা সেই সূরা যাতে আসমান দীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরা এবং এর পূর্ববর্তী সূরা 'তাকবীর'-এর বিষয়বস্তু পরস্পর সদৃশ। এ হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, এ উভয় সূরা প্রায় একই ও কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তীরমিযী, ইবনুল মুনযির, 'তাবরানী, হাকেম ও ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে' উমর রসূলে করীমের (সঃ) নিম্নোক্ত কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كَانَّهُ رَاْيَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

- 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায়, সে যেন সূরা আত তাকবীর, সূরা আল ইনফিতার, সূরা আল ইনশিকাক্ পাঠ করে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম কিয়ামতের চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার নিজের যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্ম সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে, যে মহান খোদা তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া ও অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় তোমরা কেমন করে পড়লে যে, তিনি সত্যিই দয়া ও অনুগ্রহই করেন, সুবিচার ও ইনসাফ করেন না? তিনি সত্যিই দয়া ও অনুগ্রহই করেন এ কথা ঠিক; তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর ইন্সাফকারীতাকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত লেখকরা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের প্রতিটি কাজ ও গতিবিধি লিখে রাখছে। শেষে অতীব বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামত হবে। সেদিন নেককার লোকেরা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে এবং পাপী লোকেরা জাহান্নামের আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। সেদিন কেউই অপর কারো কাজে আসবে না। আর চূড়ান্ত ফয়সালার ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে রয়েছে।

এক তার রুকু — মক্কী ইনফিতার সূরা — উনিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَ إِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَ إِذَا الْبِحَارُ

সাগর যখন এবং বিক্ষিপ্ত হবে তারকাসমূহ যখন এবং ফেটে যাবে আকাশ যখন

فُجِّرَتْ ۝٣ وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

সে আগে পাঠিয়েছে যা প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে উন্মোচিত করা হবে কবরগুলো যখন এবং বিদীর্ণ করা হবে

وَ أَخَّرَتْ ۝٥ يَٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦

যিনি মহান তোমার রবের ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে কিসে মানুষ হে পিছনে ছেড়েছে এবং

সূরা আল ইনফিতার

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৯, মোট রুকু ঃ ১

১। যখন আকাশমন্ডল চূর্ণ - বিদীর্ণ হবে,

২। যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

৩। যখন সমূদ্রসমূহ দীর্ণ - বিদীর্ণ করা হবে,

৪। আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে[১],

৫। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।

৬। হে মানুষ, কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান খোদার ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে?

১। কবরসমূহ খুলে দেয়ার অর্থ -মানুষের পুনরুজ্জীবিত করে উত্থিত করা।

الَّذِىْ	خَلَقَكَ	فَسَوّٰىكَ	فَعَدَلَكَ ۙ (৭)	فِىْٓ	اَىِّ	صُوْرَةٍ
যিনি	তোমাকে সৃষ্টি করেছেন	তোমাকে অতঃপর সম্পূর্ণতা দিয়েছেন	তোমাকে অতঃপর ভারসাম্য করেছেন	মধ্যে	যে	আকৃতিতে

مَّا	شَآءَ	رَكَّبَكَ ۗ (৮)	كَلَّا	بَلْ	تُكَذِّبُوْنَ	بِالدِّيْنِ ۙ (৯)	وَ	اِنَّ
(যা) যেমন	চেয়েছেন	তোমাকে গঠন করেছেন	কক্ষণও নয়	বরং	তোমরা মিথ্যা মনে করছ	শেষ বিচারকে	এবং	নিশ্চয়

عَلَيْكُمْ	لَحٰفِظِيْنَ ۙ (১০)	كِرَامًا	كَاتِبِيْنَ ۙ (১১)	يَعْلَمُوْنَ	مَا	تَفْعَلُوْنَ (১২)	اِنَّ
তোমাদের উপর	তত্ত্বাবধায়করা (আছে) অবশ্যই	সম্মানিত	লেখকবৃন্দ	তারা জানে	যা	তোমরা কর	নিশ্চয়

الْاَبْرَارَ	لَفِىْ	نَعِيْمٍ (১৩)	وَ	اِنَّ	الْفُجَّارَ	لَفِىْ	جَحِيْمٍ (১৪)
পুন্যবান ব্যক্তিরা	মধ্যে অবশ্যই (থাকবে)	আনন্দে (সুখে-শান্তিতে)	এবং	নিশ্চয়	পাপাচারীরা	অবশ্যই মধ্যে (যাবে)	দোজখের

يَّصْلَوْنَهَا	يَوْمَ	الدِّيْنِ (১৫)	وَ	مَا	هُمْ	عَنْهَا	بِغَآئِبِيْنَ (১৬)
সেখানে তারা প্রবেশ করবে	দিনে	বিচার	এবং	না	তারা	তা থেকে	অনুপস্থিত (থাকতে সক্ষম হবে)

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ-সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন

৮। এবং যে প্রতিকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন ?

৯। কক্ষণও নয়,[২] বরং (আসল কথা হল) তোমরা পুরস্কারকে ও শাস্তিকে মিথ্যা মনে করছ[৩]।

১০-১২। অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে এমন সম্মানিত লেখক যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানেন।

১৩। নিঃসন্দেহে সত্যপন্থী লোকেরা সুখ-শান্তিতে থাকবে।

১৪। এবং নিশ্চয় পাপাচারী লোকেরা জাহান্নামে যাবে।

১৫-১৬। বিচারের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তাথেকে কক্ষণই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

২। অর্থাৎ এই ধোঁকার মধ্যে পড়ার কোন যুক্তি-সংগত কারণ নেই।

৩। অর্থাৎ যে কারণে তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছো তার পিছনে কোন যুক্তি প্রমান নেই। এ তোমাদের এ নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণারই ফলশ্রুতি মাত্র। তোমরা মনে করে বসে আছো ঃ এ কর্মক্ষেত্রের পরিণামে কর্মফল লাভের কোন ক্ষেত্র নেই। এই ভ্রান্ত ধারণাই তোমাদেরকে খোদার ব্যাপারে বেখেয়াল, তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে নির্ভয় এবং নিজেদের নৈতিক আচার-আচরণে দায়িত্বহীন করে দিয়েছে।

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا

এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি (সেই) দিন বিচারের অতঃপর কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই

يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَ الْاَمْرُ

দিন বিচারের সেদিন না সক্ষম হবে কেউ কারও জন্যে কিছু (করতে) এবং কর্তৃত্ব

يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝١٩

সেদিন (হবে শুধুমাত্র) আল্লাহর জন্যে

১৭। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ?

১৮। অতপর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ?

১৯। সে দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই থাকবে।

সূরা আল মুতাফ্ফিফীন

নামকরণ

প্রথম আয়াতের وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ হ'তে নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার বাচন ভংগী ও বিষয় বস্তু হ'তে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সময় মক্কাবাসীদের মন-মগজে পরকালের বিশ্বাস বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে পরপর কয়েকটি সূরা অবতীর্ণ হয়। মক্কাবাসীরা যখন মুসলমানদের প্রতি পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে ও মজলিস-বৈঠকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো এবং তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু অত্যাচার, যুলুম, দৈহিক নিপীড়ন ও মারপিট তখনো শুরু করেনি. ঠিক সেই সময়ই বর্তমান সূরাটি নাযিল হয়। কোন কোন মুফাস্সীরের মতে এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। আসলে এ একটা ভুল ধারণা এবং এ ভুল ধারণার কারণ হলো হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, 'নবী করীম (সঃ) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজন ও মাপে কম করার ও ঠকাবার রোগ ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন আল্লাহতা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করলেন। এরপর লোকেরা ঠিক ঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে শুরু করে (নাসায়ী, ইব্নে মাজাহ্, ইব্নে মারদূয়া, ইব্নে জরীর, বায়হাকী)।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা দাহ্র-এর ভূমিকায় বলেছি, সাহাবা ও তাবেঈন সাধারণত কোন আয়াত কোন বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খেলে অমনি বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যদিও আসলে আয়াতটি ঠিক সে বিষয় বা ব্যাপার উপলক্ষে নাযিল হয়নি। কাজেই ইব্নে আব্বাস বর্ণিত হাদীস হতে শুধু এতটুকুই প্রমানিত হয় যে, হিজরতের পর নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপস্থিত হ'য়ে লোকদের মধ্যে উল্লেখিতরূপ বদঅভ্যাস দেখতে পেয়ে এ সূরাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। এতে তাদের এই বদঅভ্যাস দূর হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু পরকাল। প্রথম ছ'টি আয়াতে কাজ-কারবারে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বেঈমানীর সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হ'তে গ্রহণকালে পুরোমাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করতো; কিন্তু অন্যদের দেবার সময় ওজন ও মাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিতো। বর্তমান সূরার প্রাথমিক ছ'টি আয়াতে এরই প্রতিবাদ এবং এরই মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটা অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উপেক্ষা ও উদাসীনতাই হচ্ছে এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাযির হ'তে হবে এবং কড়া-ক্রান্তির হিসাব দিতে হবে, এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়-মনে বদ্ধমূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজ-কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো 'পলিসি' মনে করে ছোট-খাটো ব্যাপারে তা পালন করলেও করতে পারে এ বিচিত্র নয়; কিন্তু সেই-ই যখন অন্য কোন ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকেই ভালো 'পলিসি' মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশ্বস্ততা ও সততা কেবল মাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও

বিশ্বস্ততা কোন পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানবিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ওপর স্থায়ী ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুনিয়ায় এ নীতির সুবিধাজনক কিংবা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয় না।

নৈতিক চরিত্রের সাথে পরকাল বিশ্বাসের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা মর্মস্পর্শী ভাষায় স্পষ্ট করে বলার পর ৭-১৭ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধপ্রবণ লোকদের খাতায় (Black list) লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। এর পর ১৮-২৮ নম্বর আয়াতে সৎলোকদের অতীব উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সে সঙ্গে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আর এ লেখনের কাজে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতারা নিযুক্ত আছে।

শেষে ঈমানদার লোকদের সান্তনা দেয়া হয়েছে, সেই সংগে কাফেরদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ যারা ঈমানদার লোকদের অপমান ও লাঞ্চনা করছে কিয়ামতের দিন এই অপরাধীরা নিজেদের এহেন আচরণের অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এবং এই ঈমানদার লোকরাই এই পাপীদের খারাপ পরিণতি দেখে নিজেদের চক্ষু শীতল করবে।

এক তার রুকু — মক্কী মুতাফফিফীন সূরা — ছত্রিশ তার আয়াত

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

ধ্বংস ঠকবাজদের জন্যে যারা যখন মেপে নেয় থেকে লোকদের তারা পুরা নেয়

কিন্তু যখন তাদের মেপে দেয় বা তাদের ওজন করে দেয় তারা কম করে দেয় না কি চিন্তাকরে ঐসব লোকরা যে তারা

পুনরুত্থিত হবে দিনের জন্যে এক মহা যেদিন দাঁড়াবে মানুষ রবের সম্মুখে বিশ্ব জাহানের কক্ষণ না

নিশ্চয় আমলনামা পাপীদের অবশ্যই মধ্যে (আছে) কয়েদখানার এবং কিসে তোমাকে বুঝাবে (কি) সেই কয়েদখানা

সূরা আল মুতাফফিফীন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩৬ ,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। ধ্বংস হীন ঠকবাজদের জন্য

২-৩। যাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে গ্রহণের সময় পুরামাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে যখন ওজন বা পরিমাপ করে দেয় তখন তারা কম করে দেয়

৪-৫। এই লোকেরা কি বোঝেনা যে, একটা মহাদিনে [১] তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে?

৬। তা সেদিন, যখন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

৭। কক্ষণই নয়, [২] নিশ্চয় পাপী লোকদের আমল-নামা 'কয়েদখানা'র দফতরভুক্ত হয়ে আছে।

৮। তুমি কি জানো সে কয়েদখানার দফতর'টা কি?

১। কিয়ামতের দিনকে মহাদিন বলা হয়েছে, কারণ এই দিনে সমস্ত মানুষ ও জিনের হিসাব-নিকাশ খোদার আদালতে একই সময় গ্রহণ করা হবে, এবং শাস্তি ও পুরস্কারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

২। অর্থাৎ দুনিয়ায় এই ধরণের অপরাধ করার পর তাহাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে-তাদের এ ধারণা ভুল।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ

দিন সম্পর্কে | মিথ্যারোপ করে | যারা | মিথ্যারোপকারী -দের জন্যে | সেদিন | ধ্বংস | চিহ্নিত | খাতা

الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى

পাঠ করা হয় | যখন | পাপী | সীমালংঘন কারী | প্রত্যেক | এ ছাড়া | এর উপর | মিথ্যারোপ করে | না | এবং | বিচারের

عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى

উপর | মরিচা ধরেছে | বরং | কক্ষণ না | পূর্ব কালের লোকদের | (এসব) উপকথা | বলে | আমাদের আয়াতসমূহ | তার উপর

قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ

তাদের রবের | থেকে | নিশ্চয় তারা | কক্ষণ না | তারা | আয় করতেছিল | যা | তাদের অন্তর গুলোর

يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦ ثُمَّ

অতঃপর | জাহান্নামে | অবশ্যই প্রবেশ করবে | নিশ্চয় তারা | অতঃপর | তারা দর্শন বঞ্চিত হবেই | সেদিন

يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧

মিথ্যারোপ করতে | যে ব্যাপারে | তোমরা ছিলে | সেই (দিন) | এই | (তাদেরকে) বলা হবে

৯। একখানা কিতাব-লিখিত।

১০। সে দিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

১১। যারা বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১২। আসলে সে দিনটিকে কেহই মিথ্যা মনে করেনা-করে কেবল সেই ব্যক্তি যে সীমা লংঘনকারী পাপী।

১৩। তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় [৩] তখন বলে, এ তো আগের কালের লোকদের কাহিনী।

১৪। কক্ষণই নয়, বরং এই লোকদের দিলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গিয়েছে। [৪]

১৫। কক্ষণই নয়, নিঃসন্দেহে সেদিন এই লোকদেরকে তাদের খোদার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

১৬। পরে তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।

১৭। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, এ সেই দিন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

৩। অর্থাৎ সেই সব আয়াত যাতে প্রতিফল-দিবসের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

৪। অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যাপারটিকে অমূলক উপকথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু যে কারণে তারা এ ব্যাপারকে অমূলক মনে করে তা হচ্ছে-এদের পাপ কাজের মলিনতা এদের মন-মগজকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এজন্য একান্ত যুক্তিসংগত কথাও তাদের কাছে যুক্তিহীন গল্প-কথা মনে হচ্ছে।

১৮। কক্ষণই নয়[৫]। নেক ব্যক্তিদের আমল-নামা 'উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে' রয়েছে।

১৯। আর তুমি কি জানো, কি সেই 'উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন লোকদের দফতর'?

২০। তা একটি সুলিখিত কিতাব,

২১। নিকটবর্তী ফেরেশতারাই তার রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

২২। নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নি'আমতের মধ্যে থাকবে

২৩। উচ্চ আসনের উপর আসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে।

২৪। তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে।

২৫। তাদেরকে উত্তম-উৎকৃষ্ট মুখ বন্ধ শরাব পান করানো হবে।

২৬। তার উপর মিশ্‌ক-এর সিল লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।

২৭। সেই শরাব তাসনীম[৬] মিশ্রিত হবে।

৫। অর্থাৎ কোনরূপ বিচার-আচার ও শাস্তি পুরস্কার হবে না বলে তাদের যে ধারণা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। 'তাসনীম'-এর অর্থ উচ্চতা। কোন ঝর্ণাকে তাসনীম বলা অর্থ -তা উচ্চস্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে অবতরণ করছে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ

(এই তাসনীম) একটি ঝর্ণা | পান করবে | তা থেকে | নৈকট্যপ্রাপ্তগণ | নিশ্চয় | যারা | অপরাধ করেছে | তারা ছিল | সাথে | যারা

اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَ

ঈমান এনেছে | বিদ্রুপ করত (তাদের সাথে) | এবং | যখন | অতিক্রম করত | তাদের পার্শ্ব দিয়ে | তারা কটাক্ষ করত | এবং

اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَ اِذَا رَاَوْهُمْ

যখন | ফিরে যেত | দিকে | তাদের পরিজনের | তারা ফিরে যেতো | উৎফুল্ল হয়ে | এবং | যখন | তাদের দেখত

قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ مَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

তারা বলত | নিশ্চয় | এসব লোক | বিভ্রান্ত অবশ্যই | এবং | না | পাঠানো হয়েছে (কাফেরদেরকে) | তাদের উপর | তত্ত্বাবধায়ক রূপে

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ

আজ অতএব | (সে দিন) যারা | ঈমান এনেছিল | সাথে | কাফেরদের | উপহাস করবে | উপর | উচ্চাসন সমূহের (বসে)

يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

তারাদেখবে | কি | সওয়াব দেয়া হল | কাফেরদের | যা | তারা করতেছিল

২৮। এটা একটা ঝরণা যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

২৯। পাপী লোকরা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপ করত।

৩০। তাদের পাশ দিয়ে যখন তারা অতিক্রম করত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত।

৩১। নিজেদের ঘরে যখন ফিরে যেত তখন তারা সুখ-সম্ভোগ সহকারে ফেরত।

৩২। আর যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত, এরা বিভ্রান্ত লোক।

৩৩। অথচ তাদেরকে তাদের ব্যাপারে রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

৩৪। কিন্তু আজ ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের উপর হাসছে।

৩৫। বিশেষ আসনে বসে তাদের অবস্থা অবলোকন করছে।

৩৬। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের 'সওয়াব' পেল তো [৭] ?

৭। এই বাক্যাংশে এক সূক্ষ্ম-বিদ্রুপ নিহিত আছে। মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া কাফেররা একটা পূণ্য কাজ বলে বিবেচনা করতো। এজন্য এখানে বলা হয়েছে - পরকালে মু'মিনেরা আনন্দ সহকারে জান্নাতের মধ্যে অবস্থান ক'রে জাহান্নামে কাফেরদেরকে দগ্ধ হতে দেখে মনে মনে বলতে থাকবে - এদের কাজের বেশ চমৎকার পূণ্যফল এরা প্রাপ্ত হচ্ছে।

সূরা আল ইনশিকাক

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ انشقت হ'তে গৃহীত। ইন্‌শিকাক' انشقاق অর্থ দীর্ণ হওয়া। এ নামের তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে আকাশ মন্ডলের দীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরাটিও মক্কীজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। এতে আলোচিত বিষয়াদি হ'তে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর কাফেরদের যুল্‌ম-পীড়ন শুরু হয়নি। অবশ্য কুরআনের আদর্শ ও আহ্বানকে মক্কায় প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা মনে করা হচ্ছিল এবং কোন সময় যে কিয়ামত হ'তে পারে এবং তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্যে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে হবে, এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে মক্কার কাফেররা স্পষ্ট অস্বীকার করছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কিয়ামত ও পরকালই- এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; তা যে নিঃসন্দেহে সত্য এবং অবধারিত, তার যুক্তিও দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, সেদিন আসমান দীর্ণ হবে, যমীন সম্প্রসারিত করে সমতল বানিয়ে দেয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুকানো রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমানাদি), তা সবই বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবেনা। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি, এ জন্যে তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই তাদের জন্যে বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর ৬-১৯ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুক- তাদের আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবার দিকে তারা-ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক- তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে এবং কোনরূপ কঠিন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমল-নামা তাদের পিছনের দিক হ'তে সামনে ফেলে দেয়া হবে। যেকোন ভাবে তাদের মৃত্যু আসুক.এটাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যুতো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়ায় একটা বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে পড়েছিল। তারা মনে করে নিয়েছিল যে, জবাবদিহির জন্যে কখনই খোদার সম্মুখে হাজির হ'তে হবেনা। তাদের ঐরূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা, আল্লাহতো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হ'তে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়ারও তো কোনই কারন নেই। দুনিয়ার জীবন হ'তে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর রঙীন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাতের আগমন, তাতে মানুষ ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলির নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হ'তে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও তেমনিই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টা তাকেই মিথ্যা মনে করে- সেই কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক আকারের আগাম খবর দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে যারা ঈমান এনে নেক আমল গ্রহণ করে তাদেরকে বে-হিসাব সুফল দানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এক তার রুকু — মক্কী ইনশিক্কাক সূরা — পচিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ﴿۱﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الْاَرْضُ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং সে নির্দেশ পালন করবে তার রবের ও তার জন্যে এটাই যথার্থ এবং যখন যমীন

مُدَّتْ ۙ﴿۳﴾ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۙ﴿۴﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا

সম্প্রসারিত করা হবে এবং নিক্ষেপ করবে যা তার মধ্যে আছে এবং তা শূন্য হয়ে যাবে এবং সে নির্দেশ পালন করবে তার রবের

وَ حُقَّتْ ؕ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا

এবং এটাই তার জন্যে যথার্থ হে মানুষ নিশ্চয় তুমি শ্রম সাধন করে চলেছে দিকে তোমার রবের (কঠোর) শ্রম সাধনা

فَمُلٰقِيْهِ ۚ﴿۶﴾

অতঃপর তাঁর (সাথে) সাক্ষাত করবে

সূরা আল-ইনশিক্কাক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ২৫ মোট রুকু' ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে

২. এবং স্বীয় খোদার নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য ইটাই যথার্থ (যে, নিজের খোদার নির্দেশ মানবে,)

৩. যমীন সম্প্রসারিত করা হবে [১],

৪. এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে [২]

৫. তা করে তার রবেরই নির্দেশ পালন করবে, আর তাই তার জন্য বাঞ্ছনীয় (যে তা পালন করে)।

৬. হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের রবের দিকেই চলে যাচ্ছ এবং তাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করবে।

১। যমীন সম্প্রসারিত করার অর্থ-সমুদ্র ও নদী ভর্তি করে দেয়া হবে, পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দেয়া হবে ও পৃথিবীর সব বন্ধুরতা ও অসমতলতা একাকার করে সমতল-প্রান্তর বানিয়ে দেয়া হবে।

২। অর্থাৎ যত মৃত মানুষ তার গর্ভে পতিত হয়ে আছে সে- সবকে সে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে মানুষের কৃতকর্মের যত সাক্ষ্যপ্রমাণ তার মধ্যে বর্তমান থাকবে তা সবই সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে আসবে। কোন জিনিসই তার মধ্যে লুকায়িত বা চাপা দেয়া থেকে যাবে না।

৭-৮. অতঃপর যার আমল-নামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে[৩]।

৯. এবং সে তার আপন জনের দিকে সানন্দচিত্তে ফিরে যাবে [৪]।

১০-১২, আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে [৫], সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিপতিত হবে।

১৩. সে নিজের ঘরে লোকজন নিয়ে আনন্দে মগ্ন ছিল।

১৪. সে মনে করছিল যে, তাকে কক্ষনই ফিরতে হবে না।

১৫. না ফিরে পারবে কিরূপে! তার রব তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

৩। অর্থাৎ তার হিস্যাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না- তুমি অমুক অমুক কাজ কেন করেছিলে? অমুক কাজ যে তুমি করেছিলে তার জন্যে তোমার কি কৈফিয়ত দেয়ার আছে? তার ভালো ভালো ও নেক কাজসমূহের সাথে তার পাপ কাজসমূহও তার আমলনামায় লিখিত থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপ কাজের তুলনায় বেশী হবে, সে জন্যে তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৪। 'আপনার জন' বলতে এক ব্যক্তির সেই সব পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীকে বুঝাচ্ছে যাদেরকে তার ন্যায় মাফ করে দেয়া হবে।

৫। সূরা আল-হাক্কায় বলা হয়েছে- "যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে"। আর এখানে বলা হয়েছে। "পিছন দিক হইতে দেওয়া হইবে"। সম্ভবতঃ ব্যাপারটা এরূপ হবে যে- সারা সৃষ্টির সামনে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করতে সে লজ্জা ও অপমানবোধ করবে, সে জন্যে সে নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু সে হাত বাড়িয়ে সামনা-সামনি গ্রহণ করুক বা পিছনের দিকে হাত লুকিয়ে গ্রহণ করুক, সর্বাবস্থায় তার আমলনামা অবশ্যই তাকে স্বহস্তে গ্রহণ করতে হবে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ⑯ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ⑰ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ⑱

পূর্ণ হয় যখন চাঁদের এবং সমাবেশ ঘটায় যা ও রাতের এবং সন্ধ্যা লালিমার আমি শপথ করছি অতএব না

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ⑲ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑳ وَاِذَا قُرِئَ

পাঠ করা হয় যখন এবং তারা ঈমান আনে না তাদের অতএব হলো কি স্তরে হতে স্তর তোমরা অবশ্য আরোহণ করবে

عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ㉑ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ㉒

মিথ্যারোপ করছে কুফরি করেছে যারা বরং তারা সিজদা করে না কুরআন তাদের কাছে

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ㉓ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ㉔ اِلَّا

তার ব্যতিক্রম মর্মন্তুদ আযাবের তাদের কাজেই সুসংবাদ দাও তারা পোষণ করছে ঐবিষয়ে যা ভাল জানেন আল্লাহ এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ㉕

নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার তাদের জন্য রয়েছে নেকীর আমল করেছে ও ঈমান এনেছে (ঐসব লোক) যারা

১৬-১৮. অতএব নয়- আমি শপথ করছি সন্ধ্যা লালিমার,রাত্রের, এবং তা যা কিছু আচ্ছন্ন করে তার; আর চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হয়;

১৯. তোমাদেরকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে [৬]।

২০ পরন্তু এই লোকদের কি হয়েছে, তারা ঈমান আনে না কেন?

২১. আর তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করেনা কেন? (সিজদার আয়াত)

২২. বরং এই কাফেররা তো উল্টা তাকেই মিথ্যা মনে করে।

২৩. অথচ তারা (নিজেদের আমল-নামায়) যা কিছু সঞ্চয় করেছে আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই জানেন [৭]।

২৪. কাজেই এদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

২৫. অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য অশেষ অফুরন্ত শুভ প্রতিফল রয়েছে।

৬। অর্থাৎ তোমরা একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবে না। যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যুর পর বরযখ তারপর পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, এরপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর তোমাদেরকে অবশ্য অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। এ কথাটি বলার জন্যে তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে;- সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার লালিমা, দিনের পর রাত্রের অন্ধকার এবং দিনের বেলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া সব মানুষ ও জীবজন্তুর দিন-শেষে গুটিয়ে আসা, চাঁদের প্রথম উদয় অবস্থা হতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হওয়া- এই কয়টি ব্যাপার প্রকাশ্য সাক্ষ্য দান করছে যে, যে বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে মানুষ বসবাস করে তার মধ্যে কোথাও চিরস্থিতি ও অপরিবর্তনীয়তা নেই। প্রতি নিয়ত পরিবর্তন-বিবর্তন ও স্তরে স্তরে ক্রম-অগ্রগতি সর্বত্র বিরাজ করছে। কাজেই মৃত্যুর শেষ হে' চকির সাথে সাথে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে-কাফেরদের এ ধারণা আদৌও সত্য নয়।

৭। এর অপর এক অর্থ হতে পারেঃ কুফরী, হিংসা-বিদ্বেষ, সত্যের প্রতি শত্রুতা, অসদিচ্ছা ও দুষ্ট মানসিকতার পুতিগন্ধময় যে আবর্জনা -স্তুপ তারা নিজেদের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভুত করে রেখেছে- তা সব কিছু আল্লাহতাআলা খুব ভালভাবে জ্ঞাত আছেন।

সূরা আল-বুরূজ

নাম করণ

প্রথম আয়াতের শব্দ البروج কে নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে আলোচিত কথাগুলো হতে স্বতঃই স্পষ্ট হয় যে, এ সূরাটি রসূলে করীমের মক্কীজীবনের ঠিক সেই অবস্থায় নাযিল হয়েছিল, যখন মুসলমানরা কঠিন অত্যাচার ও যুলুম-পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। এ সময় মক্কার কাফেররা মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও যুলুম চালিয়ে তাদেরকে ঈমান হতে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল।

মূল বিষয়-বস্তু

কাফেররা ঈমানদারদের ওপর যেঅত্যাচার ও পীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সংগে মুসলমানদেরকে এই সান্ত্বনা দেয়া যে, তারা যদি এই যুলুম - পীড়ন ও নিষ্পেষণের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের ওপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেয়া হবে এবং আল্লাহ এই যালেমদের ওপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন-এটাই হ'ল এ সূরার বিষয়বস্তু এবং মূল বক্তব্য।

এ প্রসংগে সূরাটিতে প্রথমে উখদুদ-ওয়ালাদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। একটি এই যে, উখদুদ-ওয়ালারা যেভাবে আল্লাহর অভিশাপ ও আঘাত পেয়েছে মক্কার কাফের-সরদাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের কোরবানী দিতে প্রস্তুত হয়েছিল, ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনক্রমেই প্রস্তুত হয়নি, অনুরূপভাবে বর্তমানের ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হ'ল সর্বপ্রকার অত্যাচার-নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেয়া-কিন্তু ঈমানের ধন কোন অবস্থায়ই হারাতে প্রস্তুত না হওয়া।

তৃতীয়, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেররা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার-ই ওপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর, সেই আল্লাহ সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান। তিনিই যমীন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। স্বীয় সত্তায়-ই তিনি প্রশংসার্হ। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরীর শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে-শুধু এটাই শেষ নয়, বরং তা ছাড়াও তারা এদের ও যুলুমের শাস্তিস্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে, এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য-এও নিঃসন্দেহ। এরপর কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর পাকড়াও আমোঘ ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোন অহমিকা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফিরাউন ও নমরূদের জনশক্তি কিছুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও এদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে, তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর আমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদের গ্রাস করে আছে। এই গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমারা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার ও অবিশ্বাস করার জন্যে বদ্ধপরিকর, সেই কুরআনের প্রতিটি কথা অটল, অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত প্রস্তরে অংকিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

এক তার রুকু　　মক্কী　বুরূজ　সূরা　　বাইশ তার আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣

শপথ আকাশের বিশিষ্ট বুরূজ এবং দিনের প্রতিশ্রুত শপথ দর্শকের ও যা পরিদৃষ্ট হয়

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا

ধ্বংস হয়েছে কর্তারা গর্তের আগুনের বিশিষ্ট ইন্ধন (প্রজ্জ্বলিত) যখন তারা (ছিল) তার পাশে

قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

উপবিষ্ট এবং তারা (ছিল) ঐ সম্পর্কে যা তারা করতেছিল মু'মিনদের সাথে প্রত্যক্ষকারী

সূরা আল-বুরূজ

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ২২, মোট রুকু' ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১-২. শপথ সুদৃঢ় দুর্গময় আকাশ-মন্ডলের [১], এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে (অর্থাৎ কিয়ামত)

৩. শপথ দর্শকের এবং সেই জিনিসের যা পরিদৃষ্ট হয় [২]।

৪-৭. ধ্বংস হয়েছে গর্তকর্তারা, (সেই গর্তকর্তারা) যাতে দাউদাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল,-যখন তারা সেই গর্তের মুখে উপবিষ্ট ছিল, আর তারা ঈমানদার লোকদের সাথে যাকিছু করতেছিল তা দেখতেছিল।[৩]

১। আকাশমন্ডলের বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র রাজি।

২। 'দর্শক' অর্থাৎ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। আর 'দৃষ্ট জিনিস' অর্থাৎ কিয়ামত, যার ভয়ংকর বিভীষিকাময় অবস্থা সব দর্শকরাই সেদিন দেখতে পাবে।

৩। গর্ত-কর্তারা অর্থাৎ সেই সব লোক যারা বড় বড় গর্তে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাতে ঈমানদার লোকদেরকে নিক্ষেপ করেছে এবং স্বচক্ষে তাদের দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য কৌতুক-সহকারে দেখেছে। 'ধ্বংস হইয়াছে' অর্থ-তাদের উপর খোদার অভিশাপ পড়েছে এবং তারা খোদার আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

প্রশংসিত পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর তারা ঈমান এনেছে যে এছাড়া তাদের থেকে (অন্যকারণে) প্রতিশোধ নিচ্ছে তারা না এবং

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

কি্ছুর সব উপর আল্লাহই এবং পৃথিবীর ও নভোমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই যিনি (এমন সত্ত্বা যে)

شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ

নাই অতঃপর মু'মিনাদের (উপর) ও মু'মিনদের নিপীড়ন করেছিল যারা নিশ্চয় সূক্ষ্মদর্শী

يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ

নিশ্চয় দহনের আযাব তাদের জন্যে (রয়েছে) ও জাহান্নামের আযাব তাদের জন্যে (রয়েছে) তাই তওবা করে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ

হতে প্রবাহিত হচ্ছে জান্নাত তাদের জন্য (রয়েছে) নেকীর আমল করেছে এবং ঈমান এনেছে যারা

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

তোমার রবের পাকড়াও নিশ্চয়ই বিরাট সাফল্য সেটাই ঝর্ণাসমূহ তার নীচ

لَشَدِيْدٌ ۝١٢ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ۝١٣

তিনি পুনঃসৃষ্টি করবেন ও অস্তিত্বদান করেন তিনিই নিশ্চয় তিনি অবশ্যই কঠিন

৮. এই ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল কেবল মাত্র এই কারণে যে, তারা সেই খোদার প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্ত্বায় স্বপ্রশংসিত,

৯. যিনি আকাশমন্ডল ও ধরিত্রী সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর সেই খোদা সবকিছু দেখেছেন।

১০. যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উপর যুলুম পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করে নি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে এবং তাদের জন্য ভস্ম হওয়ার শাস্তি নির্দিষ্ট।

১১. যেসব লোক ঈমান আনল এবং যারা নেক আমল করল, নিশ্চিতই তাদের জন্য জান্নাতের বাগিচা রয়েছে, যার নিচ হতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান। এটা বিরাট সাফল্য।

১২. মূলতঃ তোমার খোদার পাকড়াও বড় শক্ত।

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا

যা সম্পন্নকারী সম্মানিত আরশের মালিক প্রেমময় ক্ষমাশীল তিনিই .এবং

يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَ

ও ফিরআউনের সৈন্যদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌছেছে কি তিনি চান

ثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللَّهُ مِن

হতে আল্লাহ অথচ মিথ্যারোপে মধ্যে (রত) কুফরী করেছে যারা বরং সামূদের

وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ

ফলকের মধ্যে সম্মানিত কুরআন তা বরং (তাদেরকে) পরিবেষ্টনকারী তাদের অলক্ষ্য

مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

সুরক্ষিত

১৪-১৫ আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর।

১৬. নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী।

১৭-১৮, তুমি কি সৈন্যদের খবর জানতে পাও নি? ফিরাউন ও সামুদ-এর (সৈন্যদের)?

১৯. কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত।

২০. অথচ আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে আছেন,

২১-২২.(তাদের অমান্যতায় এই কুরআনের কোনই ক্ষতি হবার নয়) বরং এই কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুরক্ষিত ফলকে [৪] (লিপিবদ্ধ)।

৪। অর্থাৎ কুরআনের লেখন অটল-অক্ষয়; তা খোদার সেই সুরক্ষিত ফলকে খোদিত যাতে কোনরূপ রদ-বদল সম্ভব নয়।

সূরা আত-তারিক

নাম করণ

প্রথম আয়াতের الطارق শব্দকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তুর বাচন ভংগী মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিককালের সূরাসমূহের অনুরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু এটা নাযিল হয়েছে তখন, যে সময়ে মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর ইসলামী দাওআতের উপর আঘাত হানবার জন্যে সকল প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করছিল।

মূল বিষয়-বস্তু

এ সূরার বক্তব্য দু'টি। প্রথম, মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহর সমুখে হাজির হতে অবশ্যই বাধ্য হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন এক চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোন কৌশল, কোন ষড়যন্ত্রই এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজের সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাহয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, একবিন্দু শুক্র কীট দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে জীবন্ত-চলন্ত ও পূর্ণাংগ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মানুষকে পুনর্বার পয়দা করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের যে সব তত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে, পরবর্তী জীবনে তার যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ হতে মানুষ না নিজের শক্তি বলে রক্ষা পেতে পারে, না এ উদ্দেশ্যে কেউ তার সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে।

উপসংহারে বলা হয়েছে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং যমীনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়, বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোন হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়। এ অতীব পাকা-পোখ্ত ও অবিচল-অটল বাণী। কাফেররা নানা কৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে বলে যে মনে করছে, এ তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা মাত্র। তারা জানে না, আল্লাহও তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরে একটি বাক্যাংশে রসূলে করীম-(সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। আর এ সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছুদিন তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশী দিন লাগবে না। তাদের অপকৌশল কুরআনকে আঘাত দিতে সমর্থ হয় না,যেখানে তারা কুরআনকে আঘাত দেবার কৌশলে লিপ্ত ঠিক সেখানে কুরআন বিজয়ী হয়, তা তারা অল্প দিনের মধ্যেই জানতে এবং নিজেদের চোখে দেখতে পারবে।

এক তার রুকু   মক্কী তারিক সূরা   সতেরো তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ① وَ مَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ②

শপথ আসমানের এবং রাত্রে আত্মপ্রকাশ কারী (নক্ষত্রের) এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই রাতে আত্মপ্রকাশ কারী

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ

নক্ষত্র উজ্জ্বল নেই কোন ব্যক্তি এ ছাড়া যে তার উপর তত্ত্বাবধায়ক অতএব লক্ষ্য করা উচিৎ

الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑥

মানুষের কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (তাকে) সৃষ্টি করা হয়েছে থেকে পানি সবেগে স্খলিত

সূরা আত-তারিক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৭, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. আসমানের শপথ, এবং শপথ রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর।

২. তুমি কি জানো রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী কি?

৩. এটা একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র

৪. এমন কোন প্রাণ নেই যার উপর কোন সংরক্ষক নিযুক্ত নেই [১]।

৫. মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. সবেগে স্খলিত পানি দিয়ে সৃষ্টিকরা হয়েছে,

১। নেঘাবান-সংরক্ষক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহতা'আলা। তিনিই পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টির দেখা-শুনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন। রাত্রিকালে আকাশে যে অসংখ্য অগণন তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ জ্বল-জ্বল করতে দেখা যায়, এর প্রত্যেকটির অস্তিত্ব সাক্ষ্য দেয় যে, অবশ্যই কেউ আছেন, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, আলোকোজ্জ্বল করেছেন এবং এদের সংরক্ষণ এমনভাবে করছেন যে, না তারা নিজেদের স্থান থেকে বিচ্যুত হতে পারছে, আর না অসংখ্য-গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন-কালে কোন পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটছে। এইভাবে আল্লাহতা'আলা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন।

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞

অবশ্যই সক্ষম | তার প্রত্যাবর্তনে | ব্যাপারে | নিশ্চয় তিনি | বক্ষপাঞ্জরের ও | পিঠ | মাঝ | থেকে | যা বের হয়

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ

ধারণকারী | আকাশের শপথ | কোন সাহায্যকারী | না | আর | কোন শক্তি | তার (থাকবে) | অতঃপর না | গোপন বিষয়াবলী | পরীক্ষা করা হবে | সেদিন

الرَّجْعِ ۞ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۞ وَمَا

না | এবং | মীমাংসাকারী | অবশ্যই বাণী | নিশ্চয় তা | বিদীর্ণ (বক্ষ) বিশিষ্ট | যমীনের (যা) | এবং | বৃষ্টি

هُوَ بِالْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ

আমি কৌশল করছি | এবং | এক ষড়যন্ত্র | ষড়যন্ত্র করছে | নিশ্চয় তারা | হাসি-ঠাট্টার কথা | তা

كَيْدًا ۞ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۞

কিছুক্ষণের | তাদের অবকাশ দাও | কাফেরদেরকে | তাই অবকাশ দাও | এক কৌশল

৭. যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয় [২]।

৮. নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় পয়দা করতে সক্ষম।

৯-১০. যেদিন গোপন-অজানা তত্ত্বসমূহ যাচাই-পরখ করা হবে [৩], তখন মানুষের নিকট না নিজের কোন শক্তি থাকবে, না কোন সাহায্যকারী তার জন্য আসবে।

১১-১২. শপথ বৃষ্টিবর্ষণকারী আকাশমন্ডলের এবং (উদ্ভিদ উৎপাদনকালে) বিদীর্ণবক্ষ যমীনের।

১৩-১৪. এ এক পরীক্ষিত-চূড়ান্ত বাণী, কোন হাসি-ঠাট্টা-মূলক কথা নয় [৪]।

১৫. এ লোকেরা (মক্কার কাফেরগণ) কিছু ষড়যন্ত্র করছে।

১৬. আর আমিও একটা বিশেষ পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনা করছি।

১৭. অতএব হে নবী, কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, কিছুটা সময় এদেরকে এদের অবস্থায় ছেড়ে দাও।

২। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রজনন-শুক্র যেহেতু মানুষের পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী দেহ-সত্তা হতে নিঃসৃত হয় এ জন্য বলা হয়েছে-মানুষকে সেই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পিঠ ও বুকের মাঝ থেকে বহির্গত হয়।

৩। 'গোপন তত্ত্ব' বলতে মানুষের সেই সব কার্যকলাপকেও বুঝান হয়েছে যা দুনিয়াতে এক গুপ্ত রহস্য হয়েছিল, এবং সেই ব্যাপারগুলোকেও বুঝানো হয়েছে যার বাহ্যিকরূপ তো মানুষের সামনে স্পষ্ট-প্রকট ছিল, কিন্তু তার পশ্চাতে যে মনোভাব ও সংকল্প, যে স্বার্থ, প্রবণতা, উদ্দেশ্য যে কামনা-বাসনা সক্রিয় ছিল, তার প্রকৃত অবস্থা মানুষের কাছে গুপ্ত থেকে গিয়েছিল।

৪। অর্থাৎ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও ভূপৃষ্ঠ দীর্ণ হয়ে য ার মধ্যদিয়ে উদ্ভিদের উদ্‌গমন যেমন কোন ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার নয়, এ যেমন একটা বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ সত্য, অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ যে ভবিষ্যৎ-সংবাদ দান করেছে ঃ 'মানুষকে আবার তার খোদার কাছে ফিরে যেতে হবে'-এ কথাও কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপর নয়, বরং এ এক অকাট্য অমোঘ-বাণী।

সূরা আল-আ'লা

নামকরণ

প্রথম আয়াত سبح اسم ربك الاعلى -এর الاعلى শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নম্বর আয়াতের কথা 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব, অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না' হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি একেবারে প্রাথমিকভাবে সেই সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম (সঃ) অহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। অহী নাযিল হবারকালে তাঁর মনে আশংকা জাগতো যে, আমি এর শব্দ ও ভাষা যেন ভুলে না যাই। এ আয়াতের সঙ্গে সূরা ত্বা-হা ১৪৪ নম্বর এবং সূরা কিয়ামাহ ১৬-১৯ নম্বর আয়াত যদি মিলিয়ে দেখা হয় এবং সে সংগে এই তিনটি আয়াতের বাচনভংগি, ক্ষেত্র ও পরিবেশ বিবেচনা করা যায়, তাহলে ঘটনার পরম্পরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন জানতে পারা যাবে যে, সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম (সঃ)কে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনি ভাবিত হবেন না। আমরা এ কালাম আপনাকে পড়িয়ে দেব। আপনি এটা ভুলে যাবেন না। অতঃপর দীর্ঘ দিন পর অপর এক সময়ে যখন সূরা 'কিয়ামাহ নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) অবচেতনভাবে অহীর শব্দসমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ "হে নবী, এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্য দ্রুত চেষ্টা করবেন না। ইহা মুখস্ত করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া তো আমাদের কাজ-আমাদেরই দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পাঠ করি তখন তুমি ইহার পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক তাছাড়া উহার অর্থ-তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্ব।" শেষ বারে সূরা ত্বা-হা - যা একসংগে ও ক্রমাগত নাযিল হলো- কোন একটি অংশও যেন তাঁর স্মৃতির বহির্ভূত হয়ে না যায় এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই উপলক্ষ্যে নবী করীম (সঃ)কে বলা হলো, "আর কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করো না- যতক্ষণ না এই অহী পুরামাত্রায় তোমার নিকট পৌছে যায়"। অতঃপর আর কোন সময় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, ভুলে যাওয়ার আশংকা কখনও হয়নি এবং এ বিষয়ে আর কোন কথা বলারও কখনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কেননা, এ তিনটি স্থান ছাড়া কুরআনের আর কোন স্থানেই এ ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মুল বক্তব্য

এই ছোট সূরাটিতে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হলো তওহীদ, নবী করীম (সঃ)কে বিশেষ উপদেশ নির্দেশ এবং পরকাল।

প্রথম আয়াতের একটি মাত্র বাক্যাংশে তওহীদের শিক্ষাকে সীমিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'আল্লাহর নামে তসবীহ কর'। অর্থাৎ আল্লাহকে এমন নামে ডেকো না যাতে কোনরূপ দোষ-ক্রটি, দুর্বলতা কিংবা সৃষ্টির সঙ্গে কোন রকমের তুলনা বা মিল থাকবে। এ হতে মুক্ত ও পবিত্র যেসব নাম, সে নামেই তাঁকে ডাক। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন ভুল ধারণা পোষণের ফলেই দুনিয়ার বহু প্রকারের বাতিল আকীদা ও মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে। এতেই আল্লাহর মহান পবিত্র সত্তার জন্য ভুল নামের প্রচলন ঘটেছে। অতএব আকীদা ও মৌল বিশ্বাস ও মতাদর্শকে নির্ভুল ও সঠিক করার জন্য মহান আল্লাহতা'আলাকে কেবল সেসব সুন্দর নির্দোষ নামে স্মরণ করতে হবে, যা তাঁর উপযুক্ত ও শোভনীয় বিবেচিত হতে পারে।

এর পর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের রব-যাঁর নামের তস্‌বীহ্‌ করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে- যিনি সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন, তাতে ভারসাম্য সংস্থাপন করেছেন, তার তকদীর নির্ধারণ করেছেন, তাকে যে উদ্দেশ্যে, যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ ও পন্থা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদরাজি সৃষ্টিও করেন এবং পরে তাকে আবার তিনিই আবর্জনায় পরিণত করেন- আল্লাহর কুদরাতের এ বিস্ময়কর বৈচিত্র তোমরা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহ ছাড়া এখানে কেউ না বসন্ত আনতে সক্ষম, না শীতের আগমন রোধ করতে সমর্থ।

অতঃপর দু'টি আয়াতে নবী করীম (সঃ)কে উপদেশ ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এ কুরআন যা আপনার ওপর নাযিল করা হচ্ছে, তা শব্দে শব্দে কেমন করে আপনার মুখস্থ থাকবে, সে বিষয়ে আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। কেননা, আপনার স্মৃতিপটে তাকে মুদ্রিত করে দেয়া তো আমার কাজ। পরন্তু তা সুরক্ষিত ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা আপনার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়। এ সম্পূর্ণরূপে আমারই অনুগ্রহের ফলশ্রুতি। নতুবা আমি চাইলে এটা ভুলিয়ে দেয়া আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।

এ কথার পর নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ শুধু মাত্র মহাসত্যের প্রচার করা। আর এ প্রচারের সোজা নিয়ম হলো এই যে, যে লোক এ উপদেশ শুনতে ও তা কবুল করতে প্রস্তুত তাকেই দিতে হবে। আর যে সে জন্য প্রস্তুত নয়, তার জন্য ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। যার মনে পথভ্রষ্টতার মারাত্মক পরিণতির ভয় আছে, সত্য দ্বীনের আহ্বান শুনতে পেয়ে সে অবশ্যই তা কবুল করবে। আর যে তা শুনতে ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না- তা হতে দূরে পালাবে, সে তার খারাপ পরিণতি নিজেই ভোগ করতে বাধ্য হবে।

উপসংহারে বলা হয়েছে, প্রকৃত কল্যাণ কেবলমাত্র তারাই পাবে, যারা আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে পরম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের আল্লাহর নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকদের অবস্থা এই যে, তারা কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, স্বার্থ-সুখ, সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-সম্ভোগের জন্যই দিন-রাত চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত হয়ে আছে। অথচ তাদের আসল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত পরকাল। পরকালীন কল্যাণই হওয়া উচিত তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কেননা এ দুনিয়া তো নশ্বর-ধ্বংসশীল। অবিনশ্বর কেবলমাত্র পরকাল। আর দুনিয়ার নি'আমতসমূহের তুলনায় পরকালের অফুরন্ত নি'আমত অধিক মূল্যবান, অধিক আরাম ও শান্তিদায়ক। এ মহাসত্য কেবল মাত্র কুরআন মজীদেই বলা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসার (আঃ) নিকট প্রেরিত সহীফাসমূহেও মানুষকে এ মহাসত্যের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়েছে।

এক তার রুকু মক্কী আ'লা সূরা উনিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قَدَّرَ	وَالَّذِي	فَسَوَّىٰ ۝٢	خَلَقَ	الَّذِي	الْأَعْلَى ۝١	رَبِّكَ	اسْمَ	سَبِّحِ
তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন	যিনি	এবং অতঃপর সম্পূর্ণ করেছেন	সৃষ্টি করেছেন	যিনি	সুমহান শ্রেষ্ঠ	তোমার রবের	নামের	তসবীহ কর

أَحْوَىٰ ۝٥	غُثَاءً	فَجَعَلَهُ	الْمَرْعَىٰ ۝٤	أَخْرَجَ	الَّذِي	فَهَدَىٰ ۝٣ وَ
কালো	আবর্জনায়	তা অতঃপর পরিণত করেছেন	উদ্ভিদ	উৎপাদন করেছেন	যিনি	এবং অতঃপর পথ দেখিয়েছেন

تَنْسَىٰ ۝٦	فَلَا	سَنُقْرِئُكَ
তুমি ভুলবে	অতঃপর না	তোমাকে শীঘ্রই আমরা পড়িয়ে দিব

সূরা আল-আ'লা
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১৯, মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১।(হে নবী!) তোমার মহান-শ্রেষ্ঠ খোদার নামে তসবীহ কর,

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন, [১]

৩। তিনি তকদীর [২] নির্দিষ্ট করেছেন, পরে পথ দেখিয়েছেন। [৩]

৪। যিনি উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন,

৫। পরে সেগুলোকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

৬। আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব, তারপর তুমি ভুলে যাবে না। [৪]

১। অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিস তিনিই পয়দা করেছেন। আর যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিকে সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, তার ভারসাম্য ও আনুপাতিকতা ঠিকভাবে কায়েম করেছেন, তাকে এমন আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে জিনিসের তার থেকে উৎকৃষ্টতর কোনরূপ চিন্তাই করা যায় না।

২। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার পূর্বে এ ব্যাপার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, সে কাজের পরিমাণ কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি অবস্থান ও কাজের জন্য ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ কি কি সংগ্রহ করতে হবে, কোন সময় তা অস্তিত্বে আসবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করবে, আর কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। -এই পুরা পরিকল্পনার সমষ্টিগত নামকেই তার 'তকদীর' বলা হয়।

৩। অর্থাৎ কোন জিনিসকেই মাত্র সৃষ্টি করেই তিনি ছেড়ে দেননি, বরং তিনি যে জিনিসই যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই কাজ সুসম্পন্ন করার পন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন।

৪। প্রাথমিক যুগে যখন অহী অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল তখন কখনও কখনও এরূপ ঘটতো যে, জিবরাঈল (আঃ) অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই নবী করীম (সঃ) ভুলে যাওয়ার আশংকায় প্রথম অংশ আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। এই কারণে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) নিশ্চয়তা দিলেন যে, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তুমি নীরবে শুনতে থাক, আমরা তোমাকে তা পড়িয়ে দিব এবং চিরকালের জন্য তা তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ও তোমার কণ্ঠস্থ থেকে যাবে।

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ

তোমাকে আমরা সহজ করে দেব | এবং | কেউ গোপন করে | যা কিছু | ও | প্রকাশ্য (বিষয়) | জানেন | নিশ্চয় তিনি | আল্লাহ চান | যা এ ব্যতীত

لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

ভয় করে | যে | সে শীঘ্রই শিক্ষানেবে | উপদেশ | কল্যাণকর হয় | যদি | অতঃপর উপদেশ দাও | সহজ (পন্থাকে)

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ

সে মরবে | না | অতঃপর | ভয়াবহ | আগুনে | পৌছবে | যে | বড় হতভাগা | তা পাশ কাটাবে | আর

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

সে অতঃপর নামাজ পড়ল | তার রবের | নাম | স্মরণ করল | এবং | পবিত্র হল | যে | সে কল্যাণ পেলো | নিশ্চয় | বাঁচবে না | আর | তার মধ্যে

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

স্থায়ী | ও | উত্তম | পরকাল | অথচ | দুনিয়ার | জীবনকে | অগ্রাধিকার দিচ্ছ তোমরা | বরং

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

মুসার | ও | ইবরাহীমের | সহীফাসমূহে | পূর্ববর্তী | ছহীফাসমূহের মধ্যে | অবশ্যই | এটা (ছিল) | নিশ্চয়

৭। তা ছাড়া যা আল্লাহ চাইবেন [৫]। তিনি বাহ্যিক অবস্থাকেও জানেন, আর যা লুকিয়ে আছে তাও।

৮। আর আমরা তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধা দিচ্ছি।

৯। কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ কল্যাণকর হয়। [৬]

১০। যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

১১-১২। আর তা থেকে পাশ কটিয়ে চলবে সেই চরম হতভাগা যে ভয়াবহ আগুনে পৌছবে।

১৩। অতঃপর সে তাতে না মরবে, না বাঁচবে।

১৪-১৫। কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং নিজের খোদার নাম স্মরণ করল, নামাযও পড়ল।

১৬। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ!

১৭। অথচ পরকাল অধিক কল্যাণময় এবং চিরস্থায়ী।

১৮-১৯। পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাসমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল-ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

৫। অর্থাৎ সমগ্র কুরআন প্রতিটি শব্দসহ রসূলুল্লাহর (সঃ) স্মরণ শক্তিতে সুরক্ষিত থেকে যাওয়া তাঁর নিজরে শক্তির কোন কীর্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই দেয়া তওফীক- সুযোগের ফলশ্রুতি মাত্র। নতুবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন।

৬। অর্থাৎ আমি দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে তোমাকে কোন কঠিণ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না, বধিরকে শুনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর কোন দায়িত্ব তোমার নয়। তোমাকে এ জন্য একটি সহজ পন্থা দান করছি ঃ তুমি নসিহত করতে থাক, যতক্ষণ তুমি অনুভব কর যে, কেউ না কেউ তোমার নসীহত থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত আছে। যেসব লোক সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি জানতে ও বুঝতে পার যে, তারা উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তাদের পিছনে পড়ার তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

সূরা আল-গাশিয়া

নামকরণ

প্রথম আয়াতের الغاشية শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরাটিতে যা কিছু বলা হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এও মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। কিন্তু এটা নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) দ্বীন-প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা তা শুনে শুনে তাকে উপেক্ষা করে চলার নীতি অবলম্বন করেছিল।

মূল বিষয়বস্তু

এ সূরার মূল বক্তব্য বুঝবার জন্য মনে রাখা আবশ্যক যে, একেবারে প্রাথমিককালে নবী করীম (সঃ) দ্বীনের তবলীগ প্রসংগে মাত্র দু'টো কথা লোকদের মনে বদ্ধমূল করার মধ্যেই তাঁর যাবতীয় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত ও সীমাবদ্ধ রাখতেন। একটা হলো তওহীদ আর দ্বিতীয়টা পরকাল। মক্কার লোকেরা এ দু'টি কথা মেনে নিতে কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। এ দু'টো কথা মেনে নিতে তারা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করছিল। এ পটভূমি বুঝে নেয়ার পরই এ সূরার মূল বক্তব্য অনুধাবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম মানুষকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত করার উদ্দেশ্যে সহসা তাদের সামনে একটা প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখো সেই সময়ের, যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? এই প্রশ্নের পরই তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটো ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুটো ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটা দল জাহান্নামে যাবে এবং তাদেরকে নানাবিধ আযাব ভোগ করতে হবে। আর অপর দলের লোক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে গমন করবে এবং তাদেরকে রকম-বেরকমের নেয়ামতসমূহ দেয়া হবে।

এভাবে লোকদেরকে হতচকিত করে দেয়ার পর সহসাই বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক সিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে, তারা কি সামনে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করে দেখে না? আরবের বিশাল মরুভূমিতে উটের ওপরই তাদের জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ উটগুলোকে যে তাদের মরু জীবনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ও উপযোগী বিশেষত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে-মরুভূমিতে চলতে পারে যেসব যোগ্যতা-দক্ষতা থাকলে তা দিয়েই যে তাকে বানানো হয়েছে, এ কথা কি তারা কখনো বিবেচনা করে দেখে না? তারা যখন সুদূর পথে যাত্রা করে, তখন তারা হয় নীল আকাশ দেখতে পায়, নয় পাহাড় কিংবা ধূ ধূ করা মাটি। এ তিনটি জিনিস সম্পর্কে তাদের চিন্তা-বিবেচনা করা কর্তব্য। উর্ধলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখের ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এসব কোন কোন মহাশক্তিমান নিরংকুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভব হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতাবলে এসব তৈরী করেছেন এবং এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরীক নেই, এ কথা যদি তারা স্বীকার করে ও মেনে নেয়, তাহলে তাঁকেই এক ও একক রব মেনে নিতে এরা অস্বীকার করবে কেন? তিনি এসব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন এ কথা যদি তারা মানে, তাহলে তিনিই যে কিয়ামত সৃষ্টিতে সক্ষম-মানুষকে পুনরায় পয়দা করতে পারবেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বানাতেও তিনি সমর্থ-এ কথা মেনে নিতে তারা দ্বিধান্বিত ও অনিচ্ছুক হবে কেন? তাদের এ দ্বিধা ও অনিচ্ছার পশ্চাতে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি?

বস্তুত ঃ অতীব সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত ধীসম্মত যুক্তির ভিত্তিতে মূল বক্তব্য এখানে পেশ করা হয়েছে এবং তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। তোমাকে এদের ওপর 'জবরদস্তিকারী' বানিয়ে পাঠানো হয়নি তো, কাজেই জোরপূর্বক এদের দ্বারা কোন কথা স্বীকার করানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তোমার কাজ হলো শুধু নসীহত করতে থাকা-নসীহত করে যাওয়া। অতএব আপনি তা-ই করে যান- করতে থাকুন। এদেরকে শেষ পর্যন্ত তো আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি এর পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবো এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি দেব।

এক তার রুকু মক্কী গাশিয়া সূরা ছাব্বিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢

খাشِعَةٌ	يَوْمَئِذٍ	وُجُوْهٌ	الْغَاشِيَةِ	حَدِيْثُ	اَتٰىكَ	هَلْ
ভীত সন্ত্রস্ত হবে	সেদিন	(অনেক) মুখমন্ডল	আচ্ছন্নকারী (কিয়ামতের)	বৃত্তান্ত	তোমার কাছে পৌছেছে	কি

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥

اٰنِيَةٍ	عَيْنٍ	مِنْ	تُسْقٰى	حَامِيَةً	نَارًا	تَصْلٰى	نَّاصِبَةٌ	عَامِلَةٌ
ফুটন্ত	ঝর্ণা	থেকে	পান করানো হবে (পানি)	উত্তপ্ত	আগুনে	ভষ্মিভূত হবে	ক্লান্ত শ্রান্ত (হবে)	কঠোর শ্রম নিরত (হবে)

সূরা আল-গাশিয়া

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ২৬, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে-

১। তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ (অর্থাৎ কিয়ামত)-এর বার্তা পৌছেছে কি?

২-৪। সেই দিন কতক মুখমন্ডল ১ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, শ্রান্ত-ক্লান্ত কাতর হবে, তীব্র অগ্নি শিখায় ভষ্মিভূত হবে।

৫। টগবগ করে ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে।

১। 'মুখমন্ডল' শব্দ এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব দেহের মধ্যে সবচাইতে বেশী প্রকাশমান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার মুখমন্ডল। এ জন্য 'কতিপয় ব্যক্তি' না বলে 'কতক মুখমন্ডল' বলা হয়েছে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِىْ

উপশম করবে না আর পুষ্ট করবে (তা) না কাটাযুক্ত ঝাড় থেকে এছাড়া (অন্য কোন) খাদ্য তাদের জন্যে নেই

مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِىْ جَنَّةٍ

জান্নাতের মধ্যে (তারা থাকবে) সন্তুষ্ট হবে তার প্রচেষ্টার জন্যে উজ্জ্বল হবে সেদিন (অনেক) মুখমন্ডল ক্ষুধা

عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا

তার মধ্যে (থাকবে) প্রবাহমান ঝর্ণা তার মধ্যে (থাকবে) কোন অর্থহীন কথা তার মধ্যে শুনবে না উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন

سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّ نَمَارِقُ

ঠেশবালিশসমূহ (থাকবে) এবং সুসজ্জিত পানপাত্রগুলো (হবে) এবং সুউচ্চ আসন সমূহ

مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ

উটের প্রতি তারা লক্ষ্য করে তবে কি না বিছানো (থাকবে) সুকোমল শয্যা এবং সারিবদ্ধ

كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَ اِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَ اِلَى

দিকে এবং উঁচু করা হয়েছে কেমন আকাশের দিকে এবং সৃষ্টি করা হয়েছে কেমন

الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

স্থাপন করা হয়েছে কেমন পর্বতমালার

৬-৭ কাটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না, যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে।

৮। কতিপয় চেহারা সেদিন চাকচিক্যময় সমুদ্ভাসিত হবে।,

৯। নিজেদের চেষ্টা সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে।

১০। উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।

১১। কোন বাজে কথা সেখানে শুনবে না।

১২। তথায় ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে,

১৩। তাতে উচ্চ আসনসমূহ থাকবে;

১৪। পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে,

১৫-১৬। ঠেশ বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং মূল্যবান সুকোমল শয্যা বিছানো থাকবে।

১৭। (এ লোকেরা যে মানছে না) এরা কি উষ্ট্রসমূহকে দেখতে পায় না- কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮। আকাশমন্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

১৯। পর্বতমালা দেখে না, কিরূপে সেগুলোকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

এবং | দিকে | যমীনের | কেমন | বিছাইয়া দেয়া হয়েছে | অতএব উপদেশ দাও | মূলতঃ | তুমি | উপদেশদাতা (মাত্র)

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ

তুমি নও | তাদের উপর | জবরদস্তিকারী | অবশ্য | যে | মুখ ফিরায় | ও | অস্বীকার করে | অতঃপর | তাকে আযাব দেবেন

اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

আল্লাহ | আযাব | কঠিন | নিশ্চয় | আমাদের দিকে | তাদের প্রত্যাবর্তন হবে | অতঃপর | নিশ্চয় | আমাদের উপর (দায়িত্ব)

حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

তাদের হিসাবের

২০। ভূমন্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? ২

২১। সে যা হোক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাক! কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র।

২২। তাদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও।

২৩-২৪। অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে আল্লাহ তাকে কঠিন-কঠোর শাস্তি দেবেন।

২৫। তাদেরকে তো প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমাদেরই নিকট।

২৬। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমাদেরই দায়িত্ব।

২। অর্থাৎ পরকাল সংক্রান্ত কথাবার্তা শুনে এরা যদি বলে এসব কেমন করে সম্ভব; তাহলে এরা কি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। এই উষ্ট্রি কিরূপে সৃষ্টি হলো? এ আকাশন্ডল কিভাবে উন্নীত হলো? এই পাহাড় কিভাবে সংস্থাপিত হলো? এই ধরণী কিভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে- এ সমস্ত জিনিস যদি সৃষ্টি হতে পারে এবং সৃষ্ট হয়েই তাদের চোখের সামনে বর্তমান আছে, তাহলে কিয়ামত হতে পারবে না কেন? পরকালে আর একটি জগত কেন গড়ে উঠতে পারবে না? বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব কেন সম্ভব নয়?

সূরা আল-ফজর

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিই এর নামরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে জানতে পারা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অত্যাচার-যুলুমের স্টীম রোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। এ কারণে এ সূরায় মক্কার লোকদেরকে আদ, সামূদ ও ফিরাউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার প্রমাণ করাই এর বিষয়বস্তু- কেননা মক্কাবাসীরা একে বিশ্বাস করতো না। এ উদ্দেশ্যে এ সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সেই পরম্পরা অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনা করা যাচ্ছে ঃ

সূরা'র শুরুতেই ফযর, দশ রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, তোমরা যে কথাকে মানছো না- অস্বীকার করছো, তার সত্যতার সাক্ষী বা প্রমাণ হিসেবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়? এ জিনিসগুলোর নামে শপথ করা হয়েছে এবং প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আল্লাহর কায়েম করা এ বিজ্ঞানসম্মত মহাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের পর এটা যিনি কায়েম করেছেন, তিনি যে পরকাল কায়েম করতে পারেন এবং মানুষের নিকট তার যাবতীয় আমলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করাই যে যুক্তির অনিবার্য দাবী তা অকাট্যভাবে প্রমাণের জন্য অপর কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণের প্রয়োজন থেকে যায় কি?

এরপর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাসখ্যাত 'আদ, সামূদ ও ফিরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে, এরা যখন সীমালংঘন করলো এবং পৃথিবীতে অকথ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করলো, তখন আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের ওপর বর্ষিত হলো। এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থা কতিপয় অন্ধ ও বধির শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। এ দুনিয়া কোন 'মগের মুল্লুক' নয়। বরং এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ-কুশলী শাসক এর ওপর রাজত্ব করছেন। তাঁর বিজ্ঞতা ও সুবিচার নীতির অনিবার্য কার্যকারিতা এ দুনিয়ায়ই মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমাগত ও বারবার অমোঘভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর ইখতিয়ার দিয়েছেন তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে তাকে শাস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তারই এক অপরিবর্তনীয় নীতি। এর ব্যতিক্রম কখনো হয়নি- হতে পারে না।

অতঃপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা তো তখন সকলের সামনে কার্যতই স্পষ্ট ছিল। এ সূরায় তার দুটো দিকের বিশেষ দৃষ্টিতে সমালোচনা পেশ করা হয়েছে। একটা হলো, লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এ কারণেই তারা নৈতিকতার ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য-বৈভব ও মান-মর্যাদা লাভ না হওয়াকেই সম্মান ও লাঞ্ছনার মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছিল। ঐশ্বর্যশীলতা যে কোন পুরস্কার নয়, রিযকের স্বল্পতাও যে কোন শাস্তি নয় এ কথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিল। আল্লাহতা'আলা যে মানুষকে এই উভয় অবস্থায় ফেলে তার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তিনি এর মাধ্যমে বাস্তবভাবে দেখতে চান যে ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েই বা মানুষ কিরূপ আচরণ গ্রহণ করে, আর্থিক সংকটের মধ্যেই বা তার আচরণ কি রকম হয়- এ কথা প্রত্যক্ষ করাই তার লক্ষ্য।

আর দ্বিতীয় এই যে, পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ইয়াতীম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরীব লোকদের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই, সুযোগ বা সুবিধা পেলেই ইয়াতীমের সব উত্তরাধিকার হরণ করা হয়; দুর্বল, অক্ষম অংশীদারদেরকে বঞ্চিত করা হয়। অর্থলোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মত মানুষকে পেয়ে বসেছে, যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধন-পিপাসা কোনক্রমেই চরিতার্থ হয় না- এটাই হলো মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। আলোচ্য সূরা'য় এরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হলো মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা জাগ্রত করা যে, এ দুনিয়ায় যে লোকদের এরূপ অবস্থা- এরূপ আচরণ ও কর্মনীতি, পরকালে তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে না কেন? তাদেরকে শাস্তি ও শুভ প্রতিফলের সম্মুখীন না করে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে কেন?

সূরার শেষ পর্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ হবে, অবশ্যই হবে। হবে সেদিন, যখন আল্লাহতা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটা বুঝতে পারবে, যা আজ শত বুঝানোর ফলেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারলে কোনই লাভ হবে না। অমান্যকারীরা সেদিন আফসোস করবে, দুনিয়ার জীবনে আমরা আজকের দিনের জন্য কোন ভালো ব্যবস্থা করিনি কেন? কিন্তু এ আফসোস সেদিন আল্লাহর আযাব হতে তাকে বাঁচাতে পারবে না। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানী সহীফা ও নবী-রসূল উপস্থাপিত মহাসত্যকে পরম আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সেদিন রাযি হবেন, আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে রাযি হবে। তাদেরকে সেদিনে আল্লাহর মনোনীত বান্দাহদের মধ্যে শামিল হবার এবং জান্নাতে দাখিল হবার উদাত্ত আহবান জানানো হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

ফযরের শপথ দশ রাতের শপথ জোড়ের ও বেজোড়ের শপথ রাতের যখন তা যেতে থাকে

কি মধ্যে (আছে) এর কোন শপথ (কোন প্রমাণ) বিবেকসম্পন্নদের জন্য তুমি দেখ নাই কি কেমন করেছেন তোমার রব

আদের সাথে এরামের স্তম্ভের অধিকারী যা (এমন ছিল যে) নাই সৃষ্টি করা হয় তার সমতুল্য (কোন জাতি) দেশ সমূহে

এবং (কেমন করেছেন) সামুদরে (সাথে) যারা খোদাই করেছিল প্রস্তর (ভূমিসমূহ) উপত্যকার (কেমন করেছেন) এবং ফিরআউনের (সাথে) (যে ছিল) অধিপতি লৌহ শলাকার (সৈন্য শিবিরের)

সূরা আল-ফযর

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ৩০, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-৪। শপথ ফযরের, দশ রাতের, জোড় ও বে-জোড়ের এবং রাতের- যখন তার অবসান হয়।

৫। এ সবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ [১] আছে কি?

৬-৭। তুমি কি দেখ নাই তোমার রব উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আদ-ইরামের জাতির সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন,

৮। যাদের মত কোন জাতি দুনিয়ার দেশসমূহে পয়দা করা হয় নাই।

৯। আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় প্রস্তর ভূমিসমূহ খোদাই করেছিল?

১০। সে সংগে লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সংগে কি ব্যবহারটা হয়েছিল।

১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়- রসূলুল্লাহ (সঃ) ও কাফেরদের পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল, হুযুর (সঃ) এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন এবং অমান্যকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছিল। এ প্রসংগে চারটি বস্তুর শপথ করে বলা হয়েছে- এই সত্য কথার সমর্থনে ও প্রমাণে সাক্ষ্যদানের জন্য এরপর আর কোন শপথের প্রয়োজন বাকী থাকে কি?

১১। এই লোকেরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমালংঘন করেছিল,

১২। এবং সেই সব স্থানে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

১৩। শেষে তোমার খোদা তাদের উপর আযাবের চাবুক বর্ষণ করলেন।

১৪। বস্তুত তোমার খোদা ঘাটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন ২।

১৫। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, তার খোদা যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নি'আমত দান করেন, তখন সে বলে ঃ আমার খোদা আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১৬। আর যখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং তার রিযক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার খোদা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন ৩।

১৭। কক্ষণও নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না,

২। ঘাটি বলা হয়- এমন গোপন স্থানকে যেখানে কোন লোক কারুর অপেক্ষায় আত্মগোপন করে বসে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, সেই লোকটি যখনি সেখানে আসবে তখনি অতর্কিতে তার উপর আক্রমণ করা হবে। লোকটি তার পরিণতি সম্পর্কে বেখবর ও নিশ্চিন্ত হয়ে সে স্থান অতিক্রম করতে যায় এবং সহসা শিকারে পরিণত হয়। যেসব লোক দুনিয়ায় অশান্তি-বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে রাখে এবংআল্লাহ যে আছেন যিনি তাদের গতিবিধি ও কার্য-কলাপের উপর লক্ষ্য রাখছেন এ কথা যারা মনেই করে না, আল্লাহর মুকাবিলায় সেই সব যালেমদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। তারা সম্পূর্ণ নির্ভীকতার সাথে দিনের পর দিন তাদের দুষ্টামি, দুষ্কৃতি, যুলুম-পীড়নের মাত্রা অধিক থেকে অধিকতর বৃদ্ধি করতে থাকে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে তারা যখন সেই সীমাটি অতিক্রম করতে চায় যার পর তাদের এগিয়ে যেতে দিতে আল্লাহ প্রস্তুত নন, তখন অকস্মাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হয়।

৩। বস্তুত একেই বলে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি ও পদ-প্রতিপত্তি লাভ করাকেই এই প্রকারের দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন লোকেরা ইজ্জত সম্মান ও তা না পাওয়াকে হীনতা ও অমর্যাদা মনে করেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা এই আসল সত্য তত্ত্বটি বুঝেনা। যে, আল্লাহতা'আলা দুনিয়াতে যাকে যা কিছু দিন না কেন, তা পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। সম্পদ ও ক্ষমতা দ্বারা হয় পরীক্ষা এবং অভাব ও দারিদ্র দ্বারাও হয় পরীক্ষা।

১৮। এবং গরীব মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

১৯। মীরাসের সব মাল সম্যকভাবে খেয়ে ফেল।

২০। ধন-সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর।

২১-২৩। কক্ষণও নয় [৪] পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটে কুটে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার খোদা আত্মপ্রকাশ করবেন- এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে এবং জাহান্নাম সেদিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়ায় কি লাভ হবে।

২৪। সে বলবে, হায়! আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম!

২৫। অতঃপর সেদিন আল্লাহ যে আযাব দিবেন, তেমন আযাব দেবার আর কেউ নেই,

২৬। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন তেমন বাঁধবারও কেউ নেই।

৪ অর্থাৎ তোমরা যে মনে করে নিয়েছ, দুনিয়ায় বেঁচে থাকা অবস্থায় তোমরা যা ইচ্ছা সব কিছু করতে থাকবে এবং কখনও তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহির সময় আসবে না- তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

২৭-২৮। (অপরদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা [৫]! তোমার রবের দিকে চল এরূপ অবস্থায় যে, তুমি (তোমার ভালো পরিণতির জন্য) সন্তুষ্ট এবং (তোমার খোদার নিকট) প্রিয়পাত্র।

২৯-৩০ আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

৫। 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সেই লোককে বুঝানো হয়েছে, যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া পূর্ণ প্রশান্তি ও চিত্তের স্থিরতা সহকারে 'লা শরীক' একমাত্র আল্লাহর নিজস্ব রব ও নবী-রসূলগণের আনীত সত্য দ্বীনকে নিজের জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছে।

সূরা আল-বালাদ

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত لاقسم بهذ البلاد -এর 'আল-বালাদ' শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মূল বক্তব্য ও বাচনভংগী মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মতই। কিন্তু এতে এমন একটা ইংগিত পাওয়া যায়, যা হতে বুঝা যায় যে, এটা নাযিল হয়েছিল তখন, যখন মক্কার কাফেররা নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর যে কোন অত্যাচার ও পীড়ন চালানোকে তারা সম্পূর্ণ হালাল মনে করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় একটা অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে ভরে দেয়া হয়েছে। এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন এ ক্ষুদ্রায়তন সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের মাধ্যমে অতীব মর্মস্পর্শী ভংগীতে বিবৃত হয়েছে, যদিও এ কথা বলার জন্য এক বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট হবে না। বস্তুত এ কুরআন মজীদের সংক্ষেপে কথাবলা ক্ষমতার এক বিরাট ও তুলনাহীন নিদর্শন। দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাব কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু। সে সংগে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভের দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা দেখবার ও বুঝবার এবং সে পথে চলার উপায় উপকরণও তিনিই পরিবেশন করে দিয়েছেন। এখন মানুষ কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, কিংবা দুর্ভাগ্য ও অমংগলের পথে চলে অত্যন্ত অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হবে, তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজের চেষ্টা ও শ্রম-মেহনতের উপর নির্ভর করে।

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য এই যে, এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোন বিশ্রাম লাভের স্থান নয়। এখানে তাকে কেবল মজা লুটবার ও স্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে কঠোর কষ্ট ও শ্রম অবস্থার মধ্যে। এ মহাসত্যটি সপ্রমাণিত ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য সূরার শুরুতেই মক্কা নগর ও তাতে স্বয়ং রসূলে করীমের (সঃ) ওপর আপতিত বিপদ-মুসীবত এবং গোটা আদম সন্তানের সার্বিক অবস্থাকে পেশ করা হয়েছে। উপরোক্ত কথাটি যদি সূরা নজম-এর ৩৯ নম্বর আয়াত ليس للانسان الاما سعى "মানুষের জন্য শুধু তাই যার জন্য সে চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে"- এর সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাহলে পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দুনিয়ার এ কর্ম ক্ষেত্রে মানুষের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র তার নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

এরপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ মনে করে যে, এ দুনিয়ায় সেই আছে, সে ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। তার কাজের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে পারে এবং তার কাজকর্মের জন্য তাকে পাকড়াও করতে পারে এমন কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তা আছে এ কথা মানুষ মনেই করে না। অথচ এটাই হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল ধারণা। অতঃপর মানুষের অসংখ্য মুর্খতাব্যঞ্জক নৈতিক ধারণার মধ্য হতে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের একটা ভ্রান্ত মানদন্ড নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়ত্বের প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সে তার এ রাজকীয়

ব্যয়-বিলাসিতার কথা বলে গৌরব করে। সাধারণ মানুষও সে জন্য তাকে খুব বাহ্‌বা দিয়ে থাকে। অথচ যে মহান সত্তা তার কাজের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন,- কোন্ উপায়ে সে অর্থোপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে কি নিয়ত নিয়ে ও কি উদ্দেশ্যে সে এ অর্থ ব্যয় করছে তা তিনি অবশ্যই দেখছেন।

এরপর আল্লাহতা'আলা বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞান অর্জনের উপায় ও পন্থা এবং চিন্তা করার, উপলব্ধি করার ও প্রকাশ করার ক্ষমতা-যোগ্যতা দিয়ে তার সম্মুখে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-কল্যাণ এবং অকল্যাণের উভয় পথই উন্মুক্ত ও সুপ্রকট করে দিয়েছি। একটা পথ মানুষকে নৈতিকতার চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্টই স্বীকার করতে হয়না। বরং এ পথে চলতে নফ্‌স খুবই আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করে। অন্য পথটি নৈতিকতার উচ্চতম পর্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। তা অত্যন্ত দুর্গম, বন্ধুর ও কষ্টসাধ্য উচ্চ ঘাঁটি বিশেষ। এ পথে চলার জন্য মানুষকে নিজেরে ওপর জোর প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু মানুষ তার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে এ ঘাঁটির ওপর আরোহণ করার পরিবর্তে অধঃপতনের গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাওয়াকেই পছন্দ করে ও অগ্রাধিকার দেয়।

শেষে আল্লাহতা'আলা উচ্চতর-উন্নত স্থানের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ঘাঁটি পথের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, দেখানোপোনা, গৌরব-অহংকার ও প্রদর্শনীমূলক অর্থ ব্যয়ের পথ পরিহার করে ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে নিজের অর্থ ব্যয় করা, আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমানদার লোকদের জামায়াতে শামিল হয়ে ধৈর্যের সাথে সত্য পথে চলার দায়িত্ব পালনকারী ও আল্লাহর সৃষ্টি নিখিলের প্রতি দয়াশীল এক সমাজ ও জাতি গঠনের বিরাট কাজে অংশগ্রহণ করাই কর্তব্য। বস্তুত এ পথে যারা চলে তাদের পরিণতি হলো আল্লাহর রহমত পাওয়া। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পথ অবলম্বনকারীর পরিণাম জাহান্নাম। তা হতে বের হওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার সব দরজাই সম্পূর্ণ বন্ধ।

এক তার রুকু | মক্কী বালাদ সূরা | বিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ

না | আমি শপথ করছি | এই | শহরের (অর্থাৎ মক্কার) | আর | তুমি | হালাল (হয়েছে) | এই | শহরে | (আরও) শপথ পিতা (আদম আঃ)

وَّمَا وَلَدَ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ أَيَحْسَبُ

এবং | যা | জন্ম দিয়েছেন (সেই সন্তানের) | নিশ্চয় | আমরা সৃষ্টি করেছি | মানুষকে | মধ্যে | কষ্টের | মনে করেছে কি সে

أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝٥ يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦

যে | কক্ষণ না | ক্ষমতাবান হবে | তার উপর | কেউ | সে বলে | আমি নিঃশেষ করেছি | ধনমাল | স্তুপ (পরিমাণ)

أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ ۝٧

সে মনে করে কি | যে | তাকে দেখে নাই | কেউ

সূরা আল-বালাদ
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ২০, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। 'না'[১] আমি শপথ করছি এই শহরের (মক্কার)।

২। আর অবস্থা এই যে. (হে নবী) এই শহরেই তোমাকে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়েছে।[২]

৩। আরো শপথ করছি পিতার (অর্থাৎ আদম (আঃ) এবং সেই সন্তানের যা তার হতে জন্মগ্রহণ করেছে।

৪। বস্তুত আমি মানুষকে কঠোর কষ্ট-শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৩]

৫। সে কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?

৬। বলে, আমি স্তুপ পরিমাণ ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।

৭। সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখে নি[৪]।

১। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তত্ত্ব তা নয় যা তোমরা মনে বুঝে রেখেছ।

২। অর্থাৎ যে শহরে পশুদের জন্যেও নিরাপত্তা রয়েছে, সেখানে তোমার উপর জুলুম করাকে বৈধ করে নেয়া হয়েছে।

৩। অর্থাৎ এই দুনিয়া মানুষের জন্য মজা লুটবার ও সুখের বাশী বাজাবার জায়গা নয়, বরং এ পৃথিবী শ্রম ও কষ্ট-কাঠিন্য স্বীকার করার স্থান, কোন মানুষই এখানে এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

৪। অর্থাৎ এই গর্বকারী কি এ কথা বুঝে না যে, উপরে কোন খোদাও আছেন যিনি দেখছেন, সে কোন্ কোন্ উপায়ে সম্পদ অর্জন করছে আর কি কি কাজে তা ব্যয় করছে?

৮-৯ আমি কি তাকে দুই চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দেই নি। [৫]

১০। আর (ভাল ও মন্দের) উভয় স্পষ্ট পথ কি তাকে দেখাইনি?

১১। কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।

১২। তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ কি?....

১৩। কোন গলা দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত করা।

১৪-১৬ কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলি-মলিন মিস্‌কীনকে খাবার খাওয়ানো।

১৭। আর (সেই সঙ্গে) শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকূলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।

১৮-১৯। ... এই লোকেরাই দক্ষিণপন্থী আর যারা আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী। [৬]

২০। তাদের উপর আগুন একেবারে বেষ্টনকারী হয়ে থাকবে।

৫। অর্থাৎ আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপায় ও উপকরণ দান করিনি?

৬। 'দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী'- এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা ওয়াকে'আর ৮-৯, ২৭ ৪১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

সূরা আশ-শাম্‌স

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ الشمس কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হতে বুঝতে পারা যায় যে, এও মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে মক্কায় যে সময় রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা খুব জোরে-শোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই এটা নাযিল হয়।

মূল বিষয়বস্তু

নেকী ও বদী-পাপ ও পূণ্যের পার্থক্য বুঝানো এর বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করা হয়েছে।

মূল বক্তব্যের দৃষ্টিতে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ সূরার শুরু হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সম্পূর্ণ। ১১ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। একঃ সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত, যমীন ও আসমান পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী পূণ্য ও পাপ ন্যায় ও অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টো তাদের বাহ্যরূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফলও কখনো এক হতে পারে না। দুইঃ আল্লাহতা'আলা মানুষকে দেহ-ইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বে-খবর করে ছেড়ে দেননি। বরং এক স্বভাবজাত 'ইল্‌হামের' সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পূণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণের কল্যাণ হওয়ার ও অকল্যাণের অকল্যাণ হওয়ার অনুভূতিও জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনঃ আল্লাহতা'আলা মানুষের মধ্যে পার্থক্যবোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনটিকে তেজস্বী করে আর কোনটিকে দমন করে, এর ওপরই তার ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি ভালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে তোলে এবং খারাপ প্রবণতা হতে নিজের নফসকে পবিত্র বানায়, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং সব খারাপ প্রবণতাকে তেজস্বী ও সমৃদ্ধ করে, তবে তার ব্যর্থতা ও অকল্যাণ অবধারিত।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে 'রেসালাত' ও নবুয়্যতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতির রক্ষিত ও গচ্ছিত ইল্‌হামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়াতের জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদন্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহতা'আলা এই স্বভাবজাত ইল্‌হামের সাহায্যের জন্য নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল অহী নাযিল করেছেন। তারা পাপ ও পূণ্য এবং ভালো ও মন্দকে লোকদের সামনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ধরবেন, দুনিয়ায় নবী ও রসূল প্রেরণের এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য এবং কারণ। সামূদ জাতির লোকদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আঃ)কে এ রকমেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানলো না- তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করলো। তাদের দাবী অনুযায়ী একটা উটনীকে যখন তিনি মুযিযারূপে তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি গোটা জাতির

ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী তাকেও হত্যা করে দিল। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করা হলো। সামূদ জাতির এ কাহিনী পেশ করে সমগ্র সূরা'র কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, 'হে কুরাইশ জনগণ! তোমরাও যদি সামূদ জাতির ন্যায় তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে মিথ্যা মনে কর ও অমান্য কর, তাহলে তোমরা সামূদ জাতির পরিণতির সম্মুখীন হবে। সামূদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ্‌র (আঃ) জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থারই উদ্ভব হয়েছিল। এই কারণে সে অবস্থার এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে এ কথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সামূদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের ওপর পুরোপুরি খেটে যাচ্ছে।

رُكُوْعُهَا ١ | سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (٩١) | اٰيَاتُهَا ١٥

এক তার রুকু — মক্কী শামস সূরা — পনেরো তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا ۝١ وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَ النَّهَارِ اِذَا

শপথ সূর্যের এবং তার রোদের শপথ চন্দ্রের যখন তার পিছে আসে শপথ দিনের যখন

جَلّٰهَا ۝٣ وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَ السَّمَآءِ وَ مَا

তাকে প্রকট করে শপথ রাতের যখন তাকে আচ্ছাদিত করে শপথ আকাশের এবং যিনি

بَنٰهَا ۝٥ وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا ۝٦

তা বানিয়েছেন শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন

সূরা আশ-শাম্‌স
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১৫, মোট রুকু ঃ ১

১। সূর্য ও তার রৌদ্রের শপথ।

২। চন্দ্রের শপথ- যখন তা তার পিছনে আসে।

৩। দিনের শপথ- যখন তা (সূর্যকে) প্রকট করে তোলে।

৪। এবং রাত্রের শপথ- যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে নেয়।

৫। আকাশমন্ডলের এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা সংস্থাপিত করেছেন।

৬। আর পৃথিবীর এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন।

৭। মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।[১]

৮। পরে তার পাপ ও তার পরহেজগারী তার প্রতি ইল্‌হাম করেছেন। [২]

৯। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল,

১০। এবং ব্যর্থ হল সে যে তাকে দমন করল। [৩]

১১। সামূদ নিজেদের সীমা লংঘনের দ্বারা অমান্য করল।

১২-১৩ সেই জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক দুষ্ট (পাষাণ হৃদয় ও হতভাগ্য) ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললঃ সাবধান আল্লাহর উষ্ট্রীকে (স্পর্শ কর না) এবং তার পানি পান করায় (বাধা দানকারী হয়ো না)।

১। অর্থাৎ তাকে এরূপ দেহ ও মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে, এরূপ ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি, এরূপ শক্তি ও সামর্থ দান করা হয়েছে যার বদৌলতে সে পৃথিবীর বুকে মানুষের উপযোগী কাজ-কর্ম করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

২। এর দুটি অর্থ আছে ঃ প্রথম, প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টা পাপ ও পূণ্য উভয়ের প্রবণতা ও ঝোঁক নিহিত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়, প্রত্যেক মানুষের চেতনার মূলে আল্লাহতয়ালা এ ধারণা ও বিশ্বাস প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় বলে একটি জিনিস আছে। ভাল চরিত্র বা ন্যায় কাজ এবং মন্দ চরিত্র বা অন্যায় কাজ কখনো সমান বা অভিন্ন হতে পারে না। 'ফুজুর'-পাপ ও চরিত্রহীনতা একটা অত্যন্ত খারাপ ও বীভৎস জিনিস। এবং 'তাকওয়া'-পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সতর্কতা এক অতি উত্তম জিনিস। বস্তুত এ সব ধারণা মানুষের জন্য কোন অপরিচিত জিনিস নয়। মানুষের প্রকৃতি এর সংগে সুপরিচিত। সৃষ্টিকর্তা, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দান করেছেন।

৩। নফসের পবিত্রতা বিধান, পরিশুদ্ধিকরণের অর্থ খারাপ ও মন্দ প্রবণতা থেকে প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করা এবং তার মধ্যে ভাল গুণের উৎকর্ষ সাধন। আর এটাকে দমিত করার অর্থ নফসের খারাপ প্রবণতার বিকাশ করা ও ভাল প্রবণতাকে দমিত করা।

فَكَذَّبُوهُ	فَعَقَرُوهَا	فَدَمْدَمَ	عَلَيْهِمْ	رَبُّهُمْ	بِذَنْبِهِمْ
তাকে তারা কিন্তু মিথ্যা ভাবল	তা অতঃপর তারা হত্যা করল	ফলে ধ্বংস করে দিলেন	তাদেরকে	তাদের রব	তাদের গুনাহর কারণে

فَسَوّٰىهَا ⑭	وَ	لَا	يَخَافُ	عُقْبٰهَا ⑮
তাদেরকে অতঃপর (মাটি) সমান করে দিলেন	এবং	না	ভয় করেন তিনি	তার (কাজের) পরিণতির

১৪। কিন্তু সেই লোকেরা তার কথাকে মিথ্যা মনে করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তিস্বরূপ তাদের খোদা তাদের উপর এমন বিপদ চাপিয়ে দিলেন যে, এক সংগে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। [৪]

১৫। আর (তাঁর এই কাজের) কোনরূপ খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই তাঁর নেই।

৪। "সেই দুর্বৃত্ত ব্যক্তি যেহেতু জাতির অনুমতি বরং তাদের দাবী অনুযায়ী উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল- যেমন সূরা কমরের ২৯তম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- সে জন্য সমগ্র জাতির উপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আল-লাইল

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের সঙ্গে সূরা আশ্‌-শাম্‌স-এর অনেকখানি মিল রয়েছে। এ মিল এতখানি যে, মনে হয়, সূরা দু'টির একটি অপরটির তফসীর। মূল বক্তব্য একই, অভিন্ন। তবে সূরা আশ-শামস্‌-এ তা একভাবে বুঝানো হয়েছে, আর এ সূরায় তাই বুঝানো হয়েছে ভিন্নভাবে। এ কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ দু'টি সূরা প্রায় একই সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু

মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এর মূল বক্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত ঃ শুরু হতে ১১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। আর ১২ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, মানব জাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়ায় যে শ্রম-মেহনত ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী, যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর কুরআনের সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহের বর্ণনাভংগি অনুযায়ী এ চেষ্টা ও শ্রমের এক বিশাল সমষ্টি হতে এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব সম্পন্ন তিনটি এবং অপর এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্বসম্পন্ন তিনটি জিনিস নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বিশেষত্ব কোন ধরনের জীবন-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে তা এ কথাগুলো শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পারে। কেননা, এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব হতে যে এক ধরনের জীবন পদ্ধতি বুঝতে পারা যায় এবং তার বিপরীত ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জীবন পদ্ধতি বুঝায় তাতো স্পষ্ট কথা। এ উভয় প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের কথা ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ও সুবিন্যস্ত বাক্যে বলা হয়েছে। এ বাক্যগুলো এতই সুন্দর যে, এ শোনা মাত্রই শ্রোতার দিলে বসে যায় ও মুখস্ত হতে একটুও বিলম্ব লাগে না। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই ঃ দান-সাদকা করা, খোদা-ভীতি ও পরহেযগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বগুলো এইঃ কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক বা বেপরোয়া হওয়া,ভালো কথাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করা। পরে বলা হয়েছে, এ দু'ধরনের কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী। অতএব তা ফলাফলের দৃষ্টিতে কখনই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। বরং সত্য কথা এই যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, তাদের ফলাফলও ঠিক অনুরূপভাবেই পরস্পর বিরোধী। প্রথম ধরনের কর্মনীতি যে ব্যক্তি বা দল ও সমাজ অবলম্বন করবে, আল্লাহতা'আলা তার জন্য জীবনের সুস্পষ্ট ও সোজা, ঋজু পথ সহজ বানিয়ে দেবেন। ফলে ভালো ও পুণ্যের কাজ করা তার পক্ষে সহজ এবং পাপ ও অন্যায় কাজ করা তার পক্ষে কঠিনতর বানিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধরনের কর্মনীতি যেই গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বাঁকা ও দুষ্কর পথ সহজ করে দেবেন। ফলে পাপ তার জন্য সহজ এবং পূণ্য ও ভালো কাজ তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ কথাটিকে এক অতীব 'মর্মস্পর্শী ও তীরের ন্যায় কলিজায় আসন গ্রহণকারী' বাক্যে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ার এ

ধন-সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত- তা তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও অনুরূপ সংক্ষেপে তিনটি মৌল তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও ঋজু তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে-বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের ওপর গ্রহণ করেছেন। তিনি যে নিজের রসূল ও স্বীয় কিতাব পাঠিয়ে নিজের নেয়া এ দায়িত্ব পালন করেছেন, তা এখানে বলে দেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়নি- প্রয়োজন ছিলও না কিছুই। কেননা রসূল (সঃ) এবং কুরআন হেদায়াতের এ দুটো ব্যবস্থা জনগণের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত ছিল। দ্বিতীয় মৌল তত্ত্ব বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত-ইহকাল ও পরকাল উভয়ের নিরংকুশ মালিক এক আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তা তাঁরই নিকট পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সেই আল্লাহই। এখন তুমি বান্দাহ তাঁর নিকট হতে কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের। তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হচ্ছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে অমান্য ও অস্বীকার করবে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে আল্লাহভীরু ব্যক্তি পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থতার সঙ্গে নিজের আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য নিজেরই ধন-মাল কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতি রাযি ও খুশী হবেন এবং তাঁর দান পেয়ে সে সন্তুষ্টচিত্ত হবে।

সূরা আল-লাইল

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ২১, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়,

২। শপথ দিনের যখন তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৩। শপথ সেই সত্তার, যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।

৪। আসলে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরন ও প্রকারের। [১]

৫-৭। পরন্তু যে লোক (খোদার পথে) ধন-মাল দিল, (খোদার নাফরমানী হতে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দিব। [২]

৮-১০। আর যে কার্পণ্য করল (খোদার প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করল তার জন্য আমি শক্ত দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করবো। [৩]

১১। তার ধন-মাল তার কোন্ কাজে আসবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে?

১২। পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব।

১৩। আর ইহকাল ও পরকালে সত্যিকার মালিক আমিই।

১৪। অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড সম্পর্কে।

১। অর্থাৎ রাত ও দিন, পুরুষ ও স্ত্রী যেমন পরস্পর ভিন্ন এবং এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন পরস্পর বিরোধী, অনুরূপভাবে মানুষ যেসব পথে ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যে নিজেদের চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করে সেগুলোও স্বরূপতার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী।

২। অর্থাৎ সেই পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব যে পথ মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির অনুকূল।

৩। অর্থাৎ স্বভাব বিরুদ্ধ পথ চলা তার জন্য সহজ করে দেব।

لَا	يَصْلٰهَا	اِلَّا	الْاَشْقَى ⑮	الَّذِیْ	كَذَّبَ	وَ	تَوَلّٰی ⑯
না	এতে ভস্মীভূত হবে	এছাড়া	চরম পাপী	যে	মিথ্যারোপ করল	এবং	মুখ ফিরালো

وَ	سَيُجَنَّبُهَا	الْاَتْقَى ⑰	الَّذِیْ	يُؤْتِیْ	مَالَهٗ	يَتَزَكّٰی ⑱	وَ
এবং	এ থেকে দূরে রাখা হবে	পরম মুত্তাকীকে	যে	দান করে	তার মাল	আত্মশুদ্ধির জন্য	এবং

مَا	لِاَحَدٍ	عِنْدَهٗ	مِنْ	نِّعْمَةٍ	تُجْزٰٓی ⑲	اِلَّا	ابْتِغَآءَ
নাই	কারও	তার উপর	কোন	অনুগ্রহ (যার)	বদলা দিতে হবে	এছাড়া	সে অন্বেষণ করে

وَجْهِ	رَبِّهِ	الْاَعْلٰی ⑳	وَ	لَسَوْفَ	يَرْضٰی ㉑
সন্তুষ্টি	তার রবের	সর্বশ্রেষ্ঠ	এবং	শীঘ্র অবশ্যাই	তিনি সন্তুষ্ট হবেন (তার প্রতি)

১৫-১৬। তাতে কেউ ভস্মীভূত হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি, যে অমান্য করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল।

১৭-১৮। আর তা হতে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে।

১৯। তার উপর কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই, যার বদলা তাকে দিতে হতে পারে।

২০। সে তো শুধু নিজের মহান-শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এই কাজ করে।

২১। তিনি অবশ্যাই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

সূরা আদ-দোহা

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ 'الضحى' কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচিত বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। হাদীসের বর্ণনা হতে জানতে পারা যায়, কিছুদিন পর্যন্ত অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম (সঃ) বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বার বার আশংকা জাগছিল, আমার দ্বারা এমন কোন অপরাধ তো হয়ে পড়েনি, যার দরুন আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন ও আমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি তাঁর প্রতি নাযিল হয়। এতে নবী করীম (সঃ)কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনরূপ অসন্তোষ নেই এবং অহী নাযিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং এ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তি ঘনীভূত করায় যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে, এর পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। সোজা কথায় বলা যায়, অহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে আপতিত হতে থাকতো এবং এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া না হতো তাহলে আপনার স্নায়ুমন্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়তো। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। এই বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন, এটাই উদ্দেশ্য। বস্তুত অহী নাযিল হওয়ার প্রাথমিককালে নবী করীমের (সঃ) স্নায়ুমন্ডলীর ওপর এক তীব্র ও দুঃসহ প্রভাব পড়তো। তখন পর্যন্তও অহীর তীব্র চাপ সহ্য করার অভ্যাস তাঁর হয়নি। এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে-মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেয়া অপরিহার্য ছিল। সূরা মুদ্দাস্সির-এর ভূমিকায় এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছি। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মত শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সে জন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর অহী নাযিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেয়ার তেমন কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি।

মূল বিষয়বস্তু

এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু হলো নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দান। অহী নাযিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীমের (সঃ) মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল তা দূর করাই এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতেই দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্টও নন। অতঃপর নবী করীম (সঃ)কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি যে সব দূরতিক্রম্য বাধা ও প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, এটা কোন স্থায়ী বা দীর্ঘদিনের ব্যাপার নয়। অল্পদিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। অবস্থা পরিবর্তন পর্যায়ে তাঁকে নীতিগতভাবে বলে দেয়া হয়েছে, আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় কার্যকর হতে থাকবে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দান ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি যার পর নেই তৃপ্ত ও গভীরভাবে সন্তুষ্ট হবেন। মূলত এটা কুরআন মজীদের অসংখ্য সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম। উত্তরকালে এ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে

পুরোপুরিভাবে। অথচ যে অবস্থায় এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পেশ করা হয়েছিল তখন এর বাস্তবতার কোন চিহ্ন দূরে ও নিকটে কোথাও পরিলক্ষিত হতো না। সেকালে মক্কানগরে যে অসহায় নিরবলম্ব ব্যক্তি সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে এত দূর সাফল্য লাভ কোন সময় সম্ভব হবে তখন তার কল্পনা করাও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন ঃ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি, এমন ধারণা তোমার মনে কেন এলো? আর আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি এ ধারণা মনে করে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেই বা কেন? আমি তো তোমার জন্মদিন হতেই তোমার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ বর্ষণ করে আসছি। তুমি জন্মগত ইয়াতীম ছিলে। তখন তোমার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে, আমিই তোমাকে পথ দেখিয়েছি। তুমি দরিদ্র ছিলে, আমিই তোমাকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছি। এসব কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তুমি শুরু হতেই আমার লক্ষ্য ও দৃষ্টির আওতাভুক্ত ছিলে। আমাদের দয়া ও অনুগ্রহ তোমার প্রতি স্থায়ীভাবে বর্ষিত হচ্ছিলো। এখানে সূরা ত্বা-হা'র ৩৭-৪২ নম্বর আয়াত সম্মুখে রাখা আবশ্যক। হযরত মূসাকে (আঃ) ফিরাউনের মত অত্যাচারী দুর্ধর্ষ শাসকের সঙ্গে বুঝা-পড়া করার উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় তাঁর মানসিক উদ্বেগ দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'আলা তাঁকে বলেছিলেন ঃ তোমার জন্ম মুহূর্ত হতেই তোমার প্রতি আমার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছিল। অতএব এ ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী ও নিঃসংগ হবে না, আমার অনুগ্রহ তোমার প্রতি থাকবে- এ ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার।

সূরার শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)কে বলেছেন, তোমার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তোমার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামত সমূহের শোকর তোমাকে কিভাবে আদায় করতে হবে, তা তুমি ভালোভাবে বুঝে নাও এবং স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখ।

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ الضُّحٰى ۝١ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ۝٣

নারাজ হয়েছেন না আর তোমার রব তোমাকে ত্যাগ করেছেন না অন্ধকারাচ্ছন্ন যখন রাতের শপথ উজ্জ্বল দিনের শপথ

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ

তোমাকে দান করবেন শীঘ্রই অবশ্য এবং পূর্ববর্তী অপেক্ষা (সময়) তোমার জন্য উত্তম পরবর্তী (সময়) নিশ্চয় এবং

رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦

অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন ইয়াতীম রূপে তোমাকে তিনি পান নাই কি তুমি ফলে খুশী হবে তোমার রব

সূরা আদ্-দোহা
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১১,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২ শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং শপথ রাত্রির যখন তা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
৩. (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কক্ষণই ত্যাগ করেন নি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।
৪. নিঃসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম ও কল্যাণময়।
৫. আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দিবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পান নি এবং পরে আশ্রয় দান করেন নি?

وَ	وَجَدَكَ	ضَآلًّا	فَهَدٰى ۞	وَ	وَجَدَكَ	عَآئِلًا	فَاَغْنٰى ۞
এবং	তোমাকে তিনি পেয়েছিলেন	পথ অনবহিত (রূপে)	তিনি অতঃপর পথ দেখিয়েছেন	এবং	তোমাকে পেয়ে ছিলেন	নিঃস্ব দরিদ্র	অতঃপর স্বচ্ছল বানিয়েছেন

فَاَمَّا	الْيَتِيْمَ	فَلَا	تَقْهَرْ ۞	وَاَمَّا	السَّآئِلَ	فَلَا	تَنْهَرْ ۞	وَ	اَمَّا
তাই ক্ষেত্রে	ইয়াতীমের	তাই না	কঠোর হয়ো	আর ক্ষেত্রে	প্রার্থীর	তাই না	তিরস্কার করো	আর	প্রসঙ্গ

بِنِعْمَةِ	رَبِّكَ	فَحَدِّثْ ۞
নিয়ামতের	তোমার রবের	অতঃপর প্রকাশ কর

৭. এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞরূপে পেয়েছেন, পরে হেদায়াত দান করেছেন।

৮. আর তোমাকে নিঃস্ব-দরিদ্র পেয়েছেন, পরে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন।

৯. অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবে না,

১০. এবং প্রার্থীকে ধিক্কার-তিরস্কার করবে না।

১১. আর তোমার রবের নি'আমতকে প্রকাশ করতে থাক।

সূরা আল-ইনশিরাহ্

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যাংশকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য সূরা আদ দোহার মতই মনে হয়, এ দুটো সূরা প্রায় একই সময়ে ও একই ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ দোহার পর নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দানই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নবুয়্যাত লাভের পর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ শুরু করার ফলে নবী করীম (সঃ) যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার পূর্বে তিনি কক্ষণই অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হননি। এই ব্যাপারটা স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) জীবনে এক বিরাট বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিল। নবুয়্যাত লাভের পূর্বে তিনি নিজেই এরূপ অবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখতেন না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতিই যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। অথচ এ সমাজ ও জাতিই তাঁকে বড় সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, গোত্রের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশী তাঁকে যারপর নেই স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করতো, তারাই তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো। তখন মক্কা শহরে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিলো না। পথ চলাকালে লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ

করতো। প্রতি পদে পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ অসুবিধা, সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগলো। যদিও ক্রমশ তিনি এই সব অবস্থা-বরং এ হতেও অনেক গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট ও কঠিনতা ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তার পক্ষে এসব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ দোহা নাযিল করা হয় এবং পরে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)কে সর্বপ্রথম বলেছেন ঃ আমি আপনাকে তিনটা বড় বড় নি'আমত দান করেছি। এ নি'আমতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনি নিরুৎসাহ ও ভারাক্রান্ত হৃদয় হবেন, তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। একটা হলো 'শরহে সাদর'-এর নি'আমত। দ্বিতীয়, নবুয়্যাতের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদন্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার ওপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখ-এর নি'আমত। এ এমন একটা নি'আমত যা আপনার তুলনায় অধিক তো দূরের কথা, আপনার সমানও কোন লোককে কোন দিন দেয়া হয়নি।

এ তিনটি নি'আমতের সঠিক তাৎপর্য কি এবং এগুলো কত বড় নি'আমত তা পরে আমরা বিশ্লেষণ করছি অতঃপর বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ ও রসূল (সঃ)কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, বর্তমানের এ কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশী দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। সূরা দোহায়ও এ কথা বলা হয়েছে এইভাবে ঃ আপনার পক্ষে প্রত্যেক পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় অনেক উত্তম ও কল্যাণময় হবে এবং অতি শীঘ্রই আপনার আল্লাহ আপনাকে এত দেবেন যে, আপনার দিল সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।
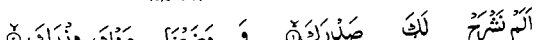
শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ)কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সমস্যা ও সংকটের মুকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো আপনি যখনই আপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগীর শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। আর সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে আপনার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকবেন। সূরা মুযযাম্মিলেও ঠিক এ হেদায়াতই তাঁকে দেয়া হয়েছে ১-৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত।

সূরা আল-ইনশিরাহ্

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ৮ , মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। (হে নবী!) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেই নি?[১]

২ এবং তোমার উপর হতে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি

ذِكْرَكَ ۝	لَكَ	رَفَعْنَا	وَ	ظَهْرَكَ ۝	اَنْقَضَ	الَّذِىْٓ
তোমার উল্লেখ	তোমার জন্যে	আমরা সুউচ্চ করছি	এবং	তোমার পিঠ	ভেঙ্গে দিচ্ছিলো	যা

يُسْرًا ۝	الْعُسْرِ	مَعَ	اِنَّ	يُسْرًا ۝	الْعُسْرِ	مَعَ	فَاِنَّ
স্বস্তি (আছে)	কষ্টের	সাথে	নিশ্চয়	স্বস্তি (আছে)	কষ্টের	সাথে	অতএব নিশ্চয়

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

তখন, মনোনিবেশ কর	তোমার রবের	প্রতি	এবং	তুমি তখন ইবাদত কর	তুমি অবসর হও	অতএব যখন

৩। যা তোমরা কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।২

৪। আর তোমারই জন্য তোমার উল্লেখ-ধ্বনি সুউচ্চ করে দিয়েছি।

৫। প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সংগে সংগে প্রশস্ততাও রয়েছে।

৬। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সংগে আছে প্রশস্ততাও।৩

৭। অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে,

৮। এবং তোমার রবের প্রতিই গভীর মনোযোগে আকৃষ্ট হবে।৪

১। বক্ষ উন্মুক্ত করার কথা কুরআন মজীদে যে কয়টি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তা একত্রে মিলিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, এর দুটি অর্থ হতে পারে ঃ এক, সব রকমের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততাসহকারে স্থির প্রত্যয় পোষণ করা যে, ইসলামের পথই মাত্র সত্য-সঠিক। দুই, উদ্যম ও সাহসিকতা, মানসিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, লক্ষ্য ও আকাংখা উন্নত হওয়া, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোন অভিযান বা কঠিন থেকে কঠিনতর কোন কার্যক্রমে রত হতে দ্বিধা-সংকোচ না করা এবং নবুয়্যতের বিরাট মহান দায়িত্বভার গ্রহণের সাহস ও উদ্যম তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া।

২। অর্থাৎ নিজ জাতির মূর্খতাসূচক ও অজ্ঞতামূলক আচরণ প্রতিনিয়ত দেখে দেখে তাঁর অনুভূতিশীল মন-মানসিকতার উপর দুঃখ-বেদনার এবং চিন্তা-উদ্বেগের যে ভারি বোঝা চেপে বসেছিল, তিনি নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করতেন, কিন্তু এই বিকৃতির প্রতিবিধানের কোন উপায় ও পন্থা তিনি দেখতে পেতেন না। এই চিন্তার বোঝা তাঁর কোমর চূর্ণ করে দিচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করে এই দুর্বহ বোঝা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন, তাঁর স্কন্ধের উপর চেপে বসা সমস্ত ভারকে লাঘব করেন; তিনি পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হন যে, ইসলামের সাহায্যে তিনি মাত্র আরবের নয় বরং সমগ্র মানব জাতিকে সেই সীমাহীন ভ্রষ্টতা ও কু-আচার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন যার জটিল জালে আরবের বাইরেও সমসাময়িক সমস্ত দুনিয়া আবদ্ধ ছিল।

৩। এই কথাটির দু'বার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে-রসূলে করীমকে (সঃ) পূর্ণ মাত্রায় আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করা যে, এ সময় তিনি যে কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছেন তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বরং এর অবসানে অতি সত্বর ভাল দিন ও কল্যাণময় অবস্থার উদ্ভব ঘটবে।

৪। অর্থাৎ যখন কোন ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না, তখন এই অবসর সময়কে ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট স্বীকারে ও আধ্যাত্ম সাধনায় অতিবাহিত কর এবং অন্য সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে-অন্য সব ঝামেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র তাঁর খোদার দিকে অন্তর ও মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও নিবদ্ধ রাখ।

সূরা আত-ত্বীন

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ التِّيْنِ কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কাতাদাহ্ বলেন, এই সূরাটি মাদানী। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে দু'টো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কায় অবতীর্ণ এবং অপরটা অনুযায়ী এটা মদীনায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। وهذا البلد الامين এটা মক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো এতে মক্কাশরীফ সম্পর্কে এই শান্তির শহর শব্দ ক'টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হয়ে থাকতো, তাহলে মক্কা শহরকে এই শহর বলে নিশ্চয় অভিহিত করা হতো না। এছাড়া সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু চিন্তা করলেও স্পষ্ট মনে হয় এটা মক্কা শরীফে নবুয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। কেননা, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় কুফর ও ইসলামের মাঝে দু'টো শক্তি হিসেবে কোন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এমন কোন চিহ্ন বা ইংগিতই সূরাটিতে পাওয়া যায় না। অথচ মাদানী পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের এ একটা বিশেষ লক্ষণ। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভংগী- সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা-ধারা তা এতে পুরোপুরি বর্তমান। পরকালের শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসংগত-এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে। ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণ করাই এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য। এ কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহামান্য নবী-রসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলা মানুষকে অতীব উত্তম আকার-আকৃতি ও দেহ সংগঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্য কথাটি বিভিন্নভাবে ও ভংগিতে বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাদের সিজ্দাবনত হবার নির্দেশ দিয়াছেন (বাক্বারা ৩-৩৪, আন'আম-১৬৫, আ'রাফ ১১, হিজ্র ২৮-২৯, নমল ৬২, সা'আদ ৭১-৭৩ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)। কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ সেই আল্লাহর দেয়া আমানতের ধারক হয়েছে, যা বহন করার শক্তি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, পর্বতমালা কোন কিছুরই ছিল না। (আহ্যাব-৭২ নম্বর আয়াত)। একস্থানে বলা হয়েছেঃ আমি বনী আদমকে সম্মান-মর্যাদা দিয়েছি এবং অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে বিশিষ্টতা দান করেছি (বনী ঈসরাইল-৭০)। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে নবী রসূলগণের আত্মপ্রকাশ স্থানের শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মানব জাতিকে এত উত্তম কাঠামো ও সুউচ্চমান দান করা হয়েছে যে, নবুয়্যাতের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছেন। আর এর এতই উচ্চ মর্যাদা যে, আল্লাহর অপর কোন সৃষ্টিই এ মর্যাদার অধিকারী হয়নি।

মূল বিষয়বস্তু

এরপর বলা হয়েছে, মানুষ দু'প্রকারের। এক প্রকারের মানুষ হলো, যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোয় সৃষ্ট হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের দিকে যেতে যেতে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যার নীচে অন্য কোন সৃষ্টি যেতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এর পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উত্তম

মান ও কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার অনিবার্য দাবীস্বরূপ উচ্চতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এ দু' প্রকারের লোকের বর্তমান থাকা এক অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা। মানব সমাজে সর্বত্র ও সকল সময়ই এ বাস্তবতার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে। কোন সময়ই এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষ ভাগে উপরোক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, মানুষের মাঝে যখন এই দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ও পরস্পর হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে কিভাবে! অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোন শাস্তি এবং উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকা লোকদেরকে কোন শুভ প্রতিফল যদি নাই দেয়া হয়, উভয় প্রকারের মানুষের পরিণাম যদি এক ও অভিন্ন হয়, তা হলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর এ জগতে ইনসাফ ও সুবিচার বলতে কোন জিনিস নেই। অথচ মানব প্রকৃতি ও মানুষের সাধারণ বিবেক অনিবার্যভাবে দাবী করে যে, বিচারক মাত্রই সুবিচার করা উচিত। তা হলে আল্লাহ-যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক-ইনসাফ ও সুবিচার করবেন না, এটা কি করে ধারণা করা যেতে পারে!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ التِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

শপথ আনজিরের এবং যয়তুনের ও তুর পর্বতের সিনাই ও এই শহরের নিরাপদ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۙ

নিশ্চয় আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে মধ্যে অতি উত্তম কাঠামোর

সূরা আত্-ত্বীন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৮, মোট রুকূ ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২। শপথ আঞ্জীর ও যয়তুনের[১] এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের

৩। এবং এই শান্তিপূর্ণ শহর (মক্কা)-এর শপথ।

৪। আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

১। অর্থাৎ যে অঞ্চলে এই সব ফল উৎপন্ন হয় (সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন) যেখানে নবীগণ অধিক সংখ্যায় পয়দা হয়েছেন।

ثُمَّ	رَدَدْنٰهُ	اَسْفَلَ	سٰفِلِيْنَ ۝٥	اِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا
এরপরে	তাকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি	অতি নীচে	সব নীচুর	(তবে) ব্যাতিক্রম	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	এবং	আমল করেছে

الصّٰلِحٰتِ	فَلَهُمْ	اَجْرٌ	غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦	فَمَا	يُكَذِّبُكَ	بَعْدُ
নেকীর	তাদের জন্য	প্রতিফল (রয়েছে)	নিরবিচ্ছিন্ন	অতঃপর কে	তোমাকে মিথ্যারোপ করতে পারে	এরপরে

بِالدِّيْنِ ۝٧	اَلَيْسَ	اللّٰهُ	بِاَحْكَمِ	الْحٰكِمِيْنَ ۝٨
বিচার দিনের ব্যাপারে	নন কি	আল্লাহ	বড় বিচারক	সব বিচারকের

৫। পরে আমরা তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌছে দিয়েছি।

৬। সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করতে থেকেছে। তাদের জন্য অশেষ শুভ প্রতিফল রয়েছে।

৭। অতএব (হে নবী!) এরূপ অবস্থায় শুভ প্রতিফল ও শাস্তির ব্যাপারে তোমাকে কে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে?

৮। আল্লাহ কি সব বিচারকের তুলনায় অধিক বড় বিচারক নন? ২

২। অর্থাৎ যখন তোমরা পৃথিবীর ছোট ছোট হাকীমদের কাছ থেকে এই আশা কর যে, তারা ইনসাফ করুক, অপরাধীদের শাস্তি দান করুক এবং ভাল ও সৎকার্যকারীদের তাদের কাজের প্রতিদান ও পুরস্কার দান করুক, তখন খোদার সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর? তোমরা কি মনে কর যে, সেই সব হাকীমদেরও হাকীম কোন বিচার করবেন না? তোমরা তাঁর কাছে থেকে এই আশা কর যে, তিনি ভাল ও মন্দকে একইরূপ করে দেবেন? ভাল ও মন্দের সাথে একইরূপ ব্যবহার করবেন? তাঁর জগতে দুষ্কর্মকারী ও সৎকর্মশীল উভয়েই মৃত্যুতে একইভাবে মৃত্তিকাতে পরিণত হবে? এবং কারুরই না দুষ্কর্মের শাস্তি মিলবে আর না সৎ কর্মের পুরস্কার?

সূরা আল-আলাক

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত শব্দ علق কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির দুটো অংশ। একাংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مالم يعلم পর্যন্ত শেষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশ كلا ان الانسان ليطغى হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশ সম্পর্কে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই ঐক্যবদ্ধভাবে এ মত পোষণ করেন যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ এটাই হলো সর্বপ্রথম অহী। ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বহু সনদসূত্রে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এ পর্যায়ে তা-ই সর্বাধিক সহীহ ও নির্ভুল হাদীস। হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজে স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) মুখে শুনে 'অহীর সূচনা সম্পর্কে পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ),আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এবং বিপুলসংখ্যক সাহাবী হতেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এ সকল সূত্র হতেই অতীব নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্বপ্রথম এই পাঁচটি আয়াতই নাযিল হয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। নবী করীম (সঃ) যখন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবু জেহেল ধমক দিয়ে এ কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময়ই এর দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দীসগণ নিজ নিজ সনদসূত্রে ইমাম যুহরী হতে তিনি উরওআহ ইব্‌নে যুবাইর হতে এবং তিনি তাঁর খালা হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে প্রথম অহী নাযিল হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন নবী করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়ার সূচনা হয়েছিল সত্য (কোন কোন বর্ণনা মতে ভালো ভালো) স্বপ্নরূপে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের উজ্জ্বল আলোকে দেখার মতই (বাস্তব) হতো। পরে তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকা পছন্দ করতেন ও তাতে অভ্যস্ত হতে লাগলেন এবং একাধারে কয়েক রাত ও দিন 'হেরা গুহায় থেকে ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত আয়িশার (রাঃ) এই কথা বুঝাবার জন্য تحنث শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী এর অর্থ করেছেন। تعبد সম্ভবত এটা এমন এক প্রকার ইবাদতের নাম যা তখন নবী করীম (সঃ) করতেন। কেননা তখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তাঁকে ইবাদতের কোন বিশেষ পদ্ধতি বলে দেয়া হয়নি। এ সময় তিনি খাদ্য ও পানীয় ঘর হতে সংগে করে নিয়ে যেতেন ও তথায় কতিপয় দিন অতিবাহিত করতেন। পরে হযরত খাদীজা (রাঃ)'র নিকট ফিরে আসতেন। তখন তিনি আরো কয়েক দিনের জরুরী সামগ্রী সংগ্রহ করে নিতেন। একদিন হেরা গুহায় থাকাকালে সহসা তাঁর প্রতি অহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললো, পড়। এরপর হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন আমি বললাম, আমি পড়তে শিখিনি। এটা শুনে ফেরেশতা আমাকে ধরে চাপ দিল- চাপে আমার সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বললো পড়। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে পারি না। সে আবার আমাকে চাপলো। আমার সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বললো اقرأ باسم ربك الذى خلق (ইক্‌রা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক) পড় তোমার সেই খোদার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং مالم يعلم 'যা সে জানে না' পর্যন্ত পৌছলো। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন অতঃপর নবী করীম (সঃ) ভীত-কম্পিত অবস্থায় সে স্থান হতে ফিরে এলেন। হযরত খাদীজার (রাঃ) নিকট পৌছে বললেন আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। - আমাকে

কম্বল জড়াও। তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো। পরে যখন তাঁর ভীত-কম্পিত অবস্থা শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, 'হে খাদীজা! এ আমার কি হয়ে গেল।' অতপর সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাঁকে শুনালেন এবং বললেন 'আমার নিজের জীবনের ভয় হয়ে গেছে'। হযরত খাদীজা (রাঃ) বললেন কক্ষণই না; আপনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর শপথ, আপনাকে আল্লাহ কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন (একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত উদ্ধৃত হয়েছে আমানতসমূহ যথাযথ ফিরিয়ে দেন)। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, দরিদ্র লোকদেরকে নিজে উপার্জন করে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন ও ভালো কাজে সাহায্য-সহায়তা করেন। পরে তিনি নবী করীম (সঃ)কে সংগে নিয়ে আরাকা ইব্‌নে নওফলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইন্‌জীল লিখতেন। এ সময় তিনি খুব বেশী বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ভাইজান! আপনার ভাইপোর ঘটনার বিবরণ শুনুন। আরাকা নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন 'ভাইপো! তুমি কি দেখতে পেয়েছ'? নবী করীম (সঃ) যা কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, তা বললেন। আরাকা বললেন এ তো নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা'র (আঃ) প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়, আমি আপনার নবুয়্যতকালে যদি যুবক বয়সের হতাম! হায়, আপনার জাতির লোকেরা যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! রসূলে করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকেরা কি আমাকে বের করে দেবে? আরাকা বললো হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তার সঙ্গে শত্রুতা করা হবে না, এমন তো কখনও হয়নি। আপনার সেইকালে আমি যদি জীবিত থাকি তা হলে আমি বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই আরাকা'র ইন্তেকাল হয়ে যায়।

এ বিবরণ অকাট্য ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ফেরেশতার আগমনের এক মুহূর্তকাল পূর্বে নবী করীম (সঃ) জানতেন না, তাঁর চিন্তা ও কল্পনায়ও কখনো এ কথা আসেনি যে, তাঁকে নবীরূপে বরণ করা হয়েছে। নবুয়্যত প্রার্থী হওয়া কিংবা তার আশা মনে পোষণ করা তো দূরের কথা। এ ধরনের একটা ঘটনা তাঁকে নিয়ে সংঘটিত হবে বা হতে পারে তার আভাসও তাঁর মনে কখনো জাগেনি। তাঁর সামনে ফেরেশতার আগমন ও অহী নাযিল হওয়ার ব্যাপারটা একটা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনামাত্র। এ কারণে এ ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর তাই দেখা দিয়েছে যা এক বে-খবর লোকের ওপর এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে। আর এ জন্যই ইসলামের দাওয়াত পেশ করার কাজ শুরু করলে মক্কার লোকেরা নবী করীমের (সঃ) ওপর নানাবিধ প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে, কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি যে, হ্যাঁ, আপনি যে কিছু একটা হওয়ার দাবী করবেন তা আগেই আমাদের জানা ছিল। কেননা আপনি তো অনেকদিন হতে নবী হওয়ার চেষ্টা-প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন।

এ কাহিনী হতে অকাট্যভাবে আরো একটা কথা জানা যায়, নবুয়্যতের পূর্বে নবী করীমের (সঃ) জীবন ছিল অতীব পবিত্র এবং তাঁর চরিত্র ছিল অতীব উন্নত। হযরত খাদীজা (রাঃ) কোন অল্প বয়স্কা অবুঝ মহিলা ছিলেন না। এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সঃ) জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্বামীর কোন দুর্বলতা থাকলে তা অন্তত স্ত্রীর নিকট গোপন থাকতে পারে না। তিনি এ দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে নবী করীম (সঃ)কে অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পেয়েছিলেন। হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা যখন তিনি শুনতে পেলেন তখনই তিনি নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ফেরেশতাই তাঁর নিকট অহী নিয়ে এসেছিলেন। আরাকা বিন্ নওফলের কথাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি মক্কারই একজন বয়বৃদ্ধ লোক। বাল্যকাল হতেই নবী করীমকে (সঃ) চোখের সামনে দেখে এসেছেন। পনের বছরের নিকটাত্মীয়তার কারণে তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আরো নিকট হতে জানবার ও গভীরভাবে বুঝবার কারণ বর্তমান ছিল। তিনিও ঘটনার বিবরণ শুনে তাকে কোনরূপ ধোঁকাবাজি বা প্রতারণামূলক ব্যাপার মনে করলেন না। বরং সংগে সংগেই উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন এতো হযরত মূসার (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁর দৃষ্টিতেও নবী করীম (সঃ) অতীব উচ্চ মর্যাদারসম্ভ্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। নবুয়্যতের মহান পদে তাঁর অভিষিক্ত

হওয়াটা তাঁর নিকট মোটেই আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়নি।

দ্বিতীয় অংশের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য

এ সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়েছে তখন, যখন নবী করীম (সঃ) হারাম শরীফের অভ্যন্তরে পুরোপুরি ইসলামী পদ্ধতিতে নামায শুরু করেছিলেন এবং আবু জেহেল তাঁকে ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল। স্পষ্ট মনে হয়, নবুয়্যত লাভ করার পরই এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার পূর্বে নবী করীম (সঃ) হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এই জিনিস দেখেই কুরাইশরা সর্বপ্রথম অনুভব করতে পারে যে, নবী করীম (সঃ) কোন নতুন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা তো রসূলের (সঃ) এ কাজকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছিল, কিন্তু এতে আবু জেহেলের জাহেলী আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগলো এবং সে তাঁকে এই বলে ধমকাতে লাগলো যে, হারামের মধ্যে এই পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ পর্যায়ে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আবু জেহেলের এ ধরনের জাহেলী কার্যক্রমের উল্লেখ হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আবু জেহেল কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করলো, মুহাম্মদ (সঃ) কি তোমাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে? লোকেরা বললো হ্যাঁ। সে বললো 'লাত ও উজ্জা'র শপথ' আমি যদি তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তাঁর গর্দানের ওপর পা রাখবো এবং তাঁর মুখ মাটির সাথে ঘষে দেব'। একবার আবু জেহেল তাঁকে নামায পড়তে দেখতে পেলো। আবু জেহেল তাঁর গর্দানের ওপর পা রাখবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো, কিন্তু সহসাই লোকেরা দেখতে পেলো যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোন জিনিস হতে নিজের মুখ রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো তাঁর (হযরত মুহাম্মদের) ও আমার মাঝে একটা অগ্নি গহ্বর ও একটা ভয়াবহ জিনিস ছিল। আর কিছু পক্ষ ছিল। রসূলে করীম (সঃ) বললেনঃ ও যদি আমার নিকটে আসতো, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জরীর, আবু হাতিম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নঈম ইসফাহানী, বায়হাকী)।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আবু জেহেল বললোঃ আমি যদি মুহাম্মদ (সঃ)কে কাবার নিকটে নামায পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তাঁর গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরবো। এ সংবাদ নবী করীমের (সঃ) শ্রুতিগোচর হয়। তখন তিনি বলেনঃ ও যদি এ রকম কিছু করে, তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যভাবে ওকে ধরবে (বুখারী , তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে জরীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া)।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন। আবু জেহেল সেখানে উপস্থিত হলো, বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আমি কি তোমাকে এটা করতে নিষেধ করিনি? এরপর সে তাঁকে ধমক দিতে শুরু করে। উত্তরে নবী করীম (সঃ) তাকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিলেন। তখন সে বললে হে মুহাম্মদ! তুমি কিসের বলে আমাকে ভয় দেখাও? আল্লাহর শপথ এ উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশী (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জরীর, ইব্‌নে আবু শাইবা, ইব্‌নুল মুনযির, তাবরানী, ইবনে মারদুইয়া)।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-আলাকের দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়। এটা كلا ان الانسان ليطغى হতে শুরু হয়েছে। পরে নাযিল হওয়া এই অংশ প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই নামাযের মাধ্যমে। কাফেরদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এই নামাযের কারণেই শুরু হয়েছিল।

এক তার রুকু মক্কী আলাক সূরা উনিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

(হে নবী) পড় নামে তোমার রবের যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে থেকে জমাট রক্তপিন্ড

اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

পড় আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল যিনি শিখিয়েছেন কলম দিয়ে শিখিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞান)

مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

যা না সে জানতো

সূরা আল আলাক
[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৯, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. পড়, (হে নবী!) তোমার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।
২. জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
৩. পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।
৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।
৫. মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না[১]।

১। এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াতসমূহ।

كَلَّآ	اِنَّ	الْاِنْسَانَ	لَيَطْغٰٓى ۝٦	اَنْ	رَّاٰهُ	اسْتَغْنٰى ۝٧	اِنَّ	اِلٰى
কক্ষণও নয়	নিশ্চয়	মানুষ	সীমা লংঘন করে অবশ্যই	(এ কারণে) যে	তাকে সে দেখে	অভাবমুক্ত	নিশ্চয়	দিকে

رَبِّكَ	الرُّجْعٰى ۝٨	اَرَءَيْتَ	الَّذِىْ	يَنْهٰى ۝٩	عَبْدًا	اِذَا	صَلّٰى ۝١٠
তোমার রবের	প্রত্যাবর্তন হবে	তুমি দেখেছ কি	(তাকে) যে	নিষেধ করে	এক বান্দাকে	যখন	সে নামায পড়ে

اَرَءَيْتَ	اِنْ	كَانَ	عَلَى	الْهُدٰىٓ ۝١١	اَوْ	اَمَرَ	بِالتَّقْوٰى ۝١٢	اَرَءَيْتَ
তুমি (ভেবে) দেখেছ কি	যদি	সে হয়	উপর	সঠিক পথের	অথবা	নির্দেশ দেয়	তাকওয়ার	তুমি (ভেবে) দেখেছ কি

اِنْ	كَذَّبَ	وَ	تَوَلّٰى ۝١٣	اَلَمْ يَعْلَمْ	بِاَنَّ	اللّٰهَ	يَرٰى ۝١٤	كَلَّا	لَئِنْ
যদি	সে অমান্য করে	ও	মুখ ফিরায় (কি পরিণাম হবে)	সে জানে নাকি	যে	আল্লাহ	দেখছেন (সব কিছু)	কক্ষণই নয়	অবশ্যই যদি

لَّمْ	يَنْتَهِ ۙ	لَنَسْفَعًۢا	بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥
না	সে বিরত হয়	আমরা অবশ্যই ধরে টানবো	সামনের কেশগুচ্ছ

৬-৭. কক্ষণও নয়২। মানুষ সীমা লংঘন করে এই কারণে যে, সে নিজেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেখতে পায়।

৮. (অথচ) ফিরে যেতে হবে নিঃসন্দেহে তোমার রবের দিকেই।

৯-১০. তুমি দেখেছ সেই লোকটিকে যে একজন বান্দাহকে নিষেধ করে যখন সে সালাত আদায় করতে থাকে।

১১-১২. তুমি কি মনে কর, যদি সেই (বান্দাহ) সঠিক পথে থাকে কিংবা পবিত্রতা-সতর্কতার শিক্ষা দান করে?

১৩. তোমার কি ধারণা, যদি (এই নিষেধকারী ব্যক্তি সত্যকে) অমান্য করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?

১৫. কক্ষণ-ই নয়। সে যদি বিরত না হয়, তা হলে আমরা তার সামনের চুল ধরে তাকে টানব!

২। নবুয়্যাতের পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পর রসূলে করীম যখন হারাম শরীফে নামায পাঠ করতে শুরু করেছিলেন ও আবুজেহেল তাঁর নামাযে বাধা দান করতে চেয়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ।

نَاصِيَةٍ	كَاذِبَةٍ	خَاطِئَةٍ ۝	فَلْيَدْعُ	نَادِيَهٗ ۝	سَنَدْعُ
সামনের কেশগুচ্ছ (টানব)	মিথ্যুকের	পাপীর	সে যেন ডাকে তখন	তার পারিষদ বর্গকে	আমরা শীঘ্র ডাকবো

الزَّبَانِيَةَ ۝	كَلَّا	لَا	تُطِعْهُ	وَ	اسْجُدْ	وَ	اقْتَرِبْ ۝
জাহান্নামের প্রহরীদেরকে	কক্ষণও নয় (সাবধান)	না	তার কথা মানবে	এবং	তুমি সিজদা কর	ও	নৈকট্য লাভ করো (তোমার রবের)

১৬. সেই মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে টানবো যে মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধকারী।

১৭. সে ডেকে নিক নিজের সমর্থকদের দলকে।

১৮. আমরাও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে নিব।

১৯. কক্ষণই-নয়, তার কথা শুনো না। আর সিজদা কর এবং (তোমার রবের) নৈকট্য লাভ কর। (সিজদার আয়াত)।

সূরা আল-ক্বাদর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের القدر শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটি মক্কী না মাদানী, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবু হাইয়্যান তাঁর البحر المحيط নামক গ্রন্থে দাবি করে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী। আলী ইব্‌নে আহমদ আল ওআহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, মদীনায় এ সূরাটিই সর্বপ্রথম নাযিল হয়। কিন্তু এর বিপরীত মতও রয়েছে। আল্লামা আল-মাওয়ার্দী বলেন, অধিক সংখ্যক কুরআনবিশারদের মতে এটা মক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী 'আল-ইতকান' গ্রন্থে এ কথাই লিখেছেন। ইব্‌নে মারদুইয়া, ইব্‌নে আব্বাস, ইবনুযযুবাইর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু চিন্তা করলেও মনে হয়, এ সূরাটি মক্কার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব এটা অবশ্যই মক্কায় নাযিল হয়ে থাকবে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

কুরআন মজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই এই সূরাটির মূল বক্তব্য। কুরআনের পরস্পরা সজ্জায়নে এ সূরাটিকে সূরা 'আল-আলাকে'র পর রাখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বতঃই মনে হয়। সূরা আল-আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যে মহান গ্রন্থ অবতরণ শুরু হয়েছিল, সেই কুরআন সম্পর্কেই এ সূরায় বলা হয়েছে যে, এ কুরআন যে রাতে অবতীর্ণ হতে শুরু করেছিল তা এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও মানুষের ভাগ্য রচনাকারী রাত ছিল। এ কিতাব অতীব মর্যাদাসম্পন্ন ও মহামূল্য গ্রন্থ এবং এর নাযিল হওয়া বড় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ সূরায় আল্লাহতা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন "আমিই এ কিতাব নাযিল করেছি।" অর্থাৎ এটা মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজস্ব কোন রচনা নয়। বরং এটা আমরাই নাযিল করা কিতাব। এরপর বলেছেন 'আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাযিল করেছি"। 'কদরের রাত' কথাটির দুটো অর্থই এখানে গ্রহণীয়। একটা এইঃ এটা সেই রাত, যে রাতে ভাগ্যসমূহের ফয়সালা করে দেয়া হয়। অন্য কথায় এটা অন্যান্য রাতের মত কোন সাধারণ রাত নয়। এটা ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের রাত। এ রাতে এ কিতাবের অবতরণ একখানি কিতাবের অবতরণই শুধু নয়, এ এমন একটা কাজ, যা কেবল কুরাইশ নয়, কেবল আরব জাতিই নয়, সমগ্র মানবজাতি ও জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে, সূরা আদ্-দোখানেও এই কথাটি বলা হয়েছে- (সূরা দোখান-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ বড়ই সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও সম্ভ্রমের রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন "এ হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম"। এ কথা দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পেশ করা এ কিতাবখানিকে নিজেদের জন্য বিপদ মনে করছো এবং কি মুসীবত হলো বলে তাকে তোমরা তিরস্কৃত করছ কেবলমাত্র নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে। অথচ যেরাতে এ কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা অতীব কল্যাণ ও অশেষ মংগলময় রাত। এ রাতে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য সেই বিরাট কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা মানবেতিহাসের হাজার হাজার মাসেও করা হয়নি। সূরা দোখান-এর ৩ নম্বর আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে স্বতন্ত্র এক ভংগীতে। ঐ সূরার ভূমিকায় আমরা তার ব্যাখ্যাও করেছি।

সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে (সূরা দোখান-এর ৪ নম্বর আয়াতে امر حكيم 'সুদৃঢ় হুকুম' বলা হয়েছে)। আর সন্ধ্যা হতে সকাল বেলা পর্যন্ত এ এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনরূপ অনিষ্টের স্থান হতে পারে না। কেননা, আল্লাহতা'আলার সমস্ত ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ রাতে কোন অন্যায় প্রার্থীত হয় না। এমনকি কোন জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে, অকল্যাণের জন্য নয়।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ②

নিশ্চয় আমরা, তা আমরা নাযিল করেছি, রাতের মধ্যে, ক্বদরের, এবং, কিসে, তোমাকে জানাবে, কি সেই, ক্বদরের রাত

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

রাত, ক্বদরের, উত্তম, হতেও, হাজার, মাস, অবতীর্ণ হয়, ফেরেশতারা, এবং, রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল)

فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ④ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

তার মধ্যে, অনুমতি ক্রমে, তাদের রবের, সব, হুকুম (সহ), শান্তির, সেই (রাত), পর্যন্ত, উদয় হওয়া, ফজরের

সূরা আল-ক্বাদর

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৫, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. আমরা তা (কুরআন) ক্বদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি।

২. তুমি কি জান ক্বদরের রাত্রি কি?

৩. ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস থেকেও অধিক উত্তম।

৪. ফেরেশ্তা ও রূহ এই (রাত্রিতে) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

৫. সেই রাত্রি পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার-ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের البينة শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়া পর্যায়ে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় তফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মক্কী। আর অপর কিছুসংখ্যক মুফাসসীর বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এটি মাদানী। ইবনুয যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, এটি মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহর এ পর্যায়ে দুটো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কী, আর অপর কথা অনুযায়ী এটি মাদানী। হযরত আয়েশা (রাঃ) একে মক্কী সূরা বলেছেন। আল-বাহারুল মুহীত গ্রন্থকার আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবদুল মুনইম ইবনুল ফারাস এ সূরাটি মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরার বক্তব্য ও বিষয়বস্তুতে এমন কোন নির্দশন বা ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে যে, এটি মক্কী কিংবা মাদানী।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

কুরআন মজীদের সূরা বিন্যাসে একে সূরা আল আলাক ও সূরা আল-ক্বাদর-এর পরে স্থান দেয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আল-আলাক-এ প্রথম অহীতে অবতীর্ণ আয়াত ক'টি রাখা হয়েছে। আর সূরা আল- ক্বদর এ তা নাযিল হওয়ার সময় তারিখ বলা হয়েছে। এ কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানোও যে অতীব প্রয়োজনীয় ছিল, তা বলা হয়েছে বর্তমান সূরাটিতে।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম রসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। আর সংক্ষেপে সে কথাটা হলো এই, দুনিয়ার মানুষ আহলি কিতাব বা মুশরিক যাই হোক না কেন, যে কুফরী অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন একজন রসূল তাদের কাছে প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তিনি আল্লাহর কিতাব লোকদের সামনে তার আসল ও অবিকৃত অবস্থায় পেশ করবেন এবং এ কিতাব বাতিলের সকল স্পর্শ ও সংমিশ্রণ হতে চিরকালই সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেভাবে বাতিল অনুপ্রবেশ করেছে ও তার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে এতে তা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না। এ কিতাব সম্পূর্ণরূপে যথাযথ সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ হবে।

এরপর আহলি-কিতাব জাতিগুলোর গুমরাহির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভিন্ন পথে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এমন কথা নয়। তাদের ভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার এটাই কারণ নয়। বরং সত্য কথা হবে যে, সঠিক পথের নির্দেশ ও বিধান তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার আগে নয়। এ হতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের গুমরাহির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এ হলো পূর্ব সম্পর্কে কথা। কিন্তু বর্তমানেও এ রসূলের মাধ্যমে এক সুস্পষ্ট ও সুউজ্জ্বল বিধান তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এখনো যদি তারা বিভ্রান্তই হতে থাকে, তাহলে তাদের এ বিভ্রান্তির জন্য তাদের দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

এ প্রসংগেই বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলার তরফ হতে যে নবী ও রসূলই এসেছেন ও যে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, তার সবই একটি মাত্র নির্দেশ দিয়েছে। আর সে নির্দেশ হলো সকল পথ-পন্থা ও নিয়ম পরিত্যাগ করে আল্লাহর নির্ভেজাল বন্দেগী করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য-উপাসনাকে তার সঙ্গে শামিল করা যেতে পারে না। নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত আদায় করতে

হবে আর চিরকালের জন্য এটাই হলো সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। এটাই হলো চিরকালের নবী-রসূল ও অবতীর্ণ কিতাবসমূহের একমাত্র ঘোষণা। এ ঘোষণা ছাড়া অন্য কিছু কিংবা এ ঘোষণার বিপরীত ঘোষণা আদৌ এবং কক্ষণই ছিল না।

এ হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলিকিতাবও আসল ও প্রকৃত দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ধর্মমতে যেসব নতুন নতুন মত, পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল। আল্লাহর এই শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন তিনিও সেই আসল দ্বীনের দিকে ফিরে আসবার জন্য তাদেরকে আকুল আহ্বান জানাচ্ছেন।

সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, যে আহলি কিতাব ও মুশরীক এ রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকাল জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়ার জীবন যাপন করবে, তারা অতীব উত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকালই বেহেশতে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি এবং তারাও রাজি আল্লাহর প্রতি। বস্তুত এ লোকদের জন্য এটাই শুভ কর্মফল।

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ

না ছিল (প্রস্তুত) যারা কুফরি করেছে মধ্য হতে আহলি কিতাবদের এবং মুশরিকদের (মধ্যহতে) (কুফরী হতে) বিরত

حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢

যতক্ষণ না তাদের কাছে আসবে অকাট্য দলিল (অর্থাৎ) একজন রাসূল পক্ষ হতে আল্লাহর যে পড়বে সহীফাসমূহ পবিত্র

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا

তার মধ্যে (থাকবে) বিধানাবলী সঠিক এবং না বিভেদে লিপ্ত হয়েছে (তারা) যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাব কিন্তু

مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤

পরে যা তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ

সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

[মদীনায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত-৮, মোট রুকু-১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফের ছিল (তারা নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না- যতক্ষণ তাদের নিকট উজ্জ্বল-অকাট্য দলীল না আসবে।

২। (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল,১ যে পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবে,

৩। যাতে সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক লেখাসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে।২

৪। পূর্বে যে লোকদিগকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট (সঠিক, নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট উজ্জ্বল বিবরণ আসার পর ব্যতীত তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় নি।৩

১। এখানে স্বয়ং রসূলে করীমকে একটি উজ্জ্বল দলিল বলা হয়েছে।

২। অর্থাৎ এরূপ পবিত্র লিপি-গ্রন্থ যাতে কোনপ্রকার বাতিল কথা, কোন প্রকারের বিভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও কোন নৈতিক পংকিলতার সংমিশ্রণ নেই।

৩। অর্থাৎ এর পূর্বে গ্রন্থধারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রষ্টতায় বিভ্রান্ত হয়ে অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল তার কারণ এই নয়, যে আল্লাহ তা'আলা তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন উজ্জ্বল অকাট্য দলীল প্রেরণ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেছিলেন। বরং আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন ও হেদায়েত আসার পর তারা এই গতি অবলম্বন করেছিল সুতরাং তারা নিজেরাই তাদের পথ-ভ্রষ্টতার জন্য দায়ী।

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ

এবং না তারা আদিষ্ট হয়েছে এছাড়া যে তারা ইবাদত করুক আল্লাহর খালেসভাবে তাঁরই জন্যে আনুগত্যকে একমুখী করে

وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ اِنَّ

এবং তারা কায়েম করবে নামায ও তারা দেবে যাকাত এবং এটাই দ্বীন সঠিক নিশ্চয়ঃ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

যারা কুফরি করেছে মধ্য হতে আহলি কিতাবদের এবং মুশরিকদের মধ্যে (থাকবে) আগুনের জাহান্নামের

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

চিরস্থায়ী (হবে) তার মধ্যে ঐসবলোক তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

আমল করেছে নেকীর ঐসব লোক তারাই উত্তম সৃষ্টি তাদের পুরস্কার (রয়েছে) কাছে তাদের রবের

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

জান্নাত চিরস্থায়ী প্রবাহিত হয় দিয়ে তার তলদেশ ঝর্ণা ধারা চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে সর্বদা

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ؕ

রাযি রয়েছেন আল্লাহ তাদের প্রতি এবং তারা রাযি হয়েছে তাঁর প্রতি এটা তাঁর জন্যে যে ভয় করে তার রবকে

৫। আর তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী করবে, -নিজেদের দ্বীনকে তারই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে, আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। মূলত এটাই অতীব সত্য-সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।

৬। আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যেসব লোক কুফরী করেছে [৪] তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে। এই লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৭। যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি।

৮। তাদের শুভ কর্মফলরূপে তাদের রবের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশতসমূহ রয়েছে যেগুলোর তলা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমানঃ থাকবে। তারা তাতে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাযি হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযি হয়েছে। এই সবকিছু তার জন্য যে নিজের রবকে ভয় করেছে।

৪। এখানে কুফরের অর্থ মুহাম্মদকে (সঃ) মান্য করতে অস্বীকার করা।

সূরা আল-যিল্‌যাল

নামকরণ

প্রথম আয়াতের زلزالها শব্দ হতে এর নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কি মাদানী এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে মাস'উদ, আতা, জাবির ও মুজাহিদ বলেন, এটা মক্কী সূরা। ইবনে আব্বাসের (রাঃ)ও একটা উক্তি এরই সমর্থনে উদ্ধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটা মাদানী সূরা। ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ)-এর অপর একটা উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে আবু হাতিম হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, এ সূরার মাদানী হওয়া সম্পর্কে তাকেই দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○

আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন আমি নিবেদন করলাম, হে রাসূলুল্লাহ (সঃ), আমি কি আমার আমল দেখবো? নবী করীম (সঃ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটা কি বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, ছোট ছোট গুনাহও কি দেখবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আমি বললাম, তাহলে তো আমি বড় বিপদে পড়বো। নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ 'সন্তুষ্ট হও-আনন্দ কর হে আবু সাঈদ! কেননা, প্রত্যেকটি নেক কাজ তারই মত দশটি নেক আমলের সমান হবে'। এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা হয় যে, এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। তাও এভাবে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং ওহুদের যুদ্ধের পর পূর্ণ বয়স্কতা পেয়েছেন। তার কথা হতে বরং বুঝা যায় এ সূরাটি যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই মাদানী সূরা হবে। কিন্তু আয়াত ও সূরার নাযিল হওয়ার উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের অবলম্বিত নীতির যে ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে সূরা 'দাহর'-এর ভূমিকায় করে এসেছি, তার ভিত্তিতে বলা যায়, কোন সাহাবী যদি বলেন যে, এ আয়াতটি অমুক অবস্থায় বা ক্ষেত্রে কিংবা উপলক্ষ্যে নাযিল হয়েছে, তবে বুঝতে হবে যে ঠিক সে সময়ই যে তা প্রথম নাযিল হয়েছে এটা প্রমাণের জন্য এটা অকাট্য দলীল নয়। কেননা এও তো হতে পারে যে সূরাটি হয়তো প্রথমে কখনো নাযিল হয়েছে। কিন্তু হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর নবী করীমের (সঃ) মুখে এ সর্বপ্রথম শুনতে পেয়ে তার শেষাংশ দ্বারা ভীত হয়ে পড়েন ও নবী করীমকে (সঃ) উক্তরূপ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেন। আর এর বিবরণ বলতে গিয়ে এমনভাবে তা বলেছেন যে, মনে হয়, তিনি বলতে চান, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন আমি নবী করীমের (সঃ) নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলাম। এ বর্ণনাটি সামনে না থাকলে কুরআন বুঝে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝবে যে, এ মাদানী নয়, মক্কী সূরা। শুধু তাই নয়,তার বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী দেখলে তো স্পষ্ট মনে হয়, এটা মক্কী পর্যায়েরও সেই প্রাথমিককালে হয়তো অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কেননা, এতে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে ইসলামের মৌল আকীদাসমূহ লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বারের জীবন এবং দুনিয়ায় করা ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সব রকমের গুনাহ্ ব্যক্তির সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠা। সর্বপ্রথম তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলা হয়েছে- মৃত্যুর

পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং তা মানুষের জন্য কিভাবে বিস্ময়য়ের উদ্রেককারী হবে। পরে দুটো ছোট বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, এ যমীনের ওপর থেকে মানুষ নিশ্চিতভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ নির্জীব জিনিস কোন এক সময় তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে তা তার চিন্তা-কল্পনায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই একদিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোন সময়, কোথায় কোন কাজ করেছে তা'ও এক এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দেবে। এরপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর কোণা-কোণা হতে মানুষ দলে দলে নিজেদের সমাধি ক্ষেত্র হতে বের হয়ে আসবে। তখন তাদের করা আমলসমূহ তাদেরকে দেখানো হবে। আর আমল দেখানোর এ অনুষ্ঠান এমন পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে হবে যে, কোন বিন্দু পরিমাণ নেক আমল কিংবা বদ আমলও গোপন থাকতে পারবে না।

رُكُوعُهَا ١ (٩٩) سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٨

এক তার রুকু — যিলযাল সূরা — আট তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢ وَ

যখন — কম্পিত করা হবে — পৃথিবী — তার (ভীষণ) কম্পনে — এবং — বের করবে — পৃথিবী — বোঝা গুলোকে — তার — এবং

قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤ بِاَنَّ

বলবে — মানুষ — তার কি হয়েছে — সেদিন — সে বর্ণনা করবে — তার-খবরাদি — কেননা

رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا

তোমার রব — হুকুম দেবেন (এইরূপ করার) — তাকে — সেদিন — ফিরে আসবে — মানুষ — বিচ্ছিন্ন অবস্থায় — দেখানোর জন্য

اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَ مَنْ

তাদের আমলসমূহকে — অতঃপর যে — আমল করবে — পরিমাণ — অণু — ভাল — তা সে দেখবে — এবং — যে

يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

আমল করবে — পরিমাণ — অণু — মন্দ — তা সে দেখবে

সূরা আল-যিলযাল

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৮, মোট রুকু ঃ ১

১. যখন পৃথিবী তার কম্পোনে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হবে।

২. এবং যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরেনিক্ষেপ করবে,

৩. এবং মানুষ বলে উঠবে, তার কি হয়েছে?

৪. সেইদিন তা নিজের (উপরে ঘটিত) সমস্ত অবস্থা বলে দিবে।

৫. কেননা, তোমার রব তাকে (এইরূপ করার) নির্দেশ দিয়ে দিবেন।

৬. সেদিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়।

৭. পরন্তু যে লোক বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখে নিবে।

৮. এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ বদ্‌ আমল করে থাকবে সেও তা দেখতে পাবে।

সূরা আল-আদিয়াত

নামকরণ

সূরার প্রথম 'আল-আদিয়াত' শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), জাবির (রাঃ), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা প্রমুখ মনীষী একে মক্কী সূরা বলেছেন, পক্ষান্তরে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) ও কাতাদাহ বলেন, এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ উভয় কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কী ও অপর কথা অনুযায়ী এটা মাদানী। কিন্তু সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এটি কেবল যে মক্কী তাই নয়, মক্কী জীবনেরও সেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা।

মূল বিষয়বস্তু

পরকালে অবিশ্বাসী কিংবা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হলে মানুষ যে কতখানি নৈতিক অধঃপতনে চলে যেতে পারে, লোকদেরকে তা বুঝিয়ে দেয়াই এ সূরা'র মূল উদ্দেশ্য। সেই সংগে এ বিষয়ে লোকদেরকে সতর্ক করে তোলাও এর লক্ষ্য যে, পরকালে তাদের কেবল বাহ্যিক কাজেরই নয়, তাদের দীলের গোপন তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ যাচাই এবং পরখ করা হবে।

এ উদ্দেশ্যে তদানীন্তন আরব সমাজের সাধারণ অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতাকে যুক্তি ও প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। তার কারণে তখন সমস্ত দেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে এসেছিল। চারদিকে মারা-মারি ও কাটা-কাটির প্রাবল্য, লুঠতরাজ ও চুরি-ডাকাতির দৌরাত্ম্য। এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল। জীবনের নিরাপত্তা বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রাত কাটানো কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কখন কোন শত্রু সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে এসে গোটা জনবসতির ওপর নির্মম আক্রমণ চালায়, তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। আরবের সমস্ত লোকই এ অবস্থা জানতো ও এর তীব্রতা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পেরেছিল। যদিও লুণ্ঠিত ব্যক্তি ফরিয়াদ করতো, আর লুণ্ঠনকারী আনন্দের উৎসব করতো। কিন্তু সে নিজে যখন বিপন্ন হয়ে পড়তো তখন গোটা দেশবাসী যে কি কঠিন দুরবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তা পুরোপুরি অনুভব করতে পারতো। সাধারণভাবে বিরাজমান এই অবস্থার দিকে ইংগিত করে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন এবং তখন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি ও হিসার-নিকাশ দেয়ার ব্যাপারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞতা থেকে মানুষ তার আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহকে সে যুলুম-নিপীড়ন ও হত্যা-লুন্ঠন প্রভৃতি অন্যায় কাজে ব্যবহার করছে। ধন ও সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে যে কোন উপায়ে তা অর্জনের জন্য নির্বিচারে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তা যতই হারাম ও বীভৎস পন্থায়ই অর্জন করা হউক না কেন, তাতে তার মনে একটুও পরোয়া বা সংকোচ জাগে না। তার অবস্থা স্বতঃই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহকে ভুল পথে ব্যবহার করে সে তার নিকট চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ছে। পরকালে তাকে যখন কবর হতে জীবিত হয়ে উঠতে হবে, তখন যেসব স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার তাকীদে দুনিয়ায় সে নানা ধরনের কাজ করেছে তা দিলের গোপন জগত হতে বের করে সামনে পেশ করে দেয়া হবে- এ কথা যদি সে এ দুনিয়ায় জানতো তা হলে সে কক্ষণই এরূপ মারাত্মক আচরণ করতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং আজ কার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা বাঞ্ছনীয়, তা সে সময় মানুষের আল্লাহ খুব ভালো করেই জানাবেন।

সূরা আল-আদিয়াত

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১১, মোট রুকু ঃ ১

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. শপথ সেই (ঘোড়াগুলোর), যা হ্রেসা ধ্বনি করে দৌড়ায়,

২. পরে (নিজের ক্ষুর দিয়ে) স্ফুলিংগ ঝাড়ে,

৩. আর অতি প্রভাতকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায়,

৪-৫. আর এই সময় ধুলি-ধু'য়া উড়ায় এবং এরূপ অবস্থায়ই কোন ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রবের বড় অকৃতজ্ঞ১।

৭. আর সে নিজেই এর সাক্ষী।২

---

১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা তাকে যে শক্তি-ক্ষমতা দান করেছেন তা সে অত্যাচার-নির্যাতনের কাজে ব্যবহার করে।

২। অর্থাৎ তার বিবেক-এর সাক্ষী, তার কর্ম-এর সাক্ষী, এবং অনেক কাফের মানুষ নিজেরা নিজেদের মুখে ও প্রকাশ্যে তাদের নিজেদের অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে।

৮. সে ধন-মালের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত।

৯-১০. তা হলে সে কি সেই সময়কে জানে না, যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে, তা বের করা হবে এবং বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বাইরে এনে যাচাই পরখ করা হবে ৩?

১১. নিঃসন্দেহে তাদের রব সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবেন ৪।

৩। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যেসব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা, যেসব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাংখা গুপ্ত আছে সে-সব কিছু প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এ সকলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে ভাল ও মন্দ, সুঁ ও কু-কে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়া হবে।

৪। অর্থাৎ তিনি খুব ভালরূপে জানিবেন- কে কিরূপ এবং কে কোন্ শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য।

সূরা আল-ক্বারিয়াহ

নামকরণ

সূরা'র প্রথম শব্দ القارعة কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মূলত এ কেবল নামই নয়, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের শিরোনামও হলো এই। কেননা, এতে কিয়ামত সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনই মতভেদ নেই। এর বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়-বস্তু ও আলোচনা

এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো 'কিয়ামত ও পরকাল'। সর্বপ্রথম এ কথা বলে লোকদেরকে কাঁপিয়ে তোলা হয়েছে ঃ 'বিরাট দুর্ঘটনা, কি সেই বিরাট দুর্ঘটনা? তুমি কি জান, সেই বিরাট দুর্ঘটনাটা কি? এভাবে কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার খবর শুনবার জন্য শ্রোতৃমন্ডলিকে উৎকর্ণ করে তোলার পর দু'টো বাক্যে কিয়ামতের অবস্থা তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। বাক্য দু'টো এই ঃ সেই দিন মানুষ ঘাবড়ানো অবস্থায় চারিদিকে এমনভাবে দৌড়িয়ে বেড়াবে যেমন আলোর চারধারে পোকাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকে। আর পাহাড়গুলো নিজেদের স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে যাবে, সেগুলোর সাথে মাটির বাঁধন ছিন্ন হয়ে যাবে ও ধুনা পশমের মত বয়ে যাবে'। পরে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের হিসাব পাবার জন্য যখন আল্লাহতা'আলার আদালত কায়েম হবে তখন- কোন্ লোকের নেক আমল তার খারাপ আমলের তুলনায় অধিক এবং কার নেক আমলের ওজন তার বদ আমলের তুলনায় কম- এটাই হবে ফয়সালা করার ভিত্তি। প্রথম ধরনের লোক এমন সুখভোগের অধিকারী হবে যা পেয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে আগুনে ভর্তি গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে।

এক তার রুকু মক্কী ক্বারিয়াহ সূরা এগারো তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ

ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা সেদিন হবে

النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾

মানুষ পতঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত এবং হবে পাহাড়সমূহ পশমের মত ধুনা

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾

অতঃপর তার (ব্যাপার) যার ভারী হবে তার (নেকীর) পাল্লাসমূহ সে অতঃপর (হবে) মধ্যে জীবনের সন্তোষপূর্ণ

সূরা আল-ক্বারিয়াহ

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১১ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. ভয়াবহ দুর্ঘটনা!

২. কি সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা?

৩, তুমি কি জান সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি?

৪-৫. সেইদিন- যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় এবং পাহাড় রং-বেরং-এর ধুনা পশমের মত হবে।

৬-৭, অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে [১] সে পছন্দমত সুখে থাকবে।

১। অর্থাৎ পূন্যের পাল্লাভারী হবে।

مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

কি সেটা (সেটা হলো) আগুন জ্বলন্ত

৮-৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর-ই হবে তার আশ্রয়স্থল।

১০. তুমি কি জান তা কি জিনিস?

১১. জ্বলন্ত আগুন!

সূরা আত-তাকাসুর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের التكاثر শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সব তফসীরকারকের মতেই এ সূরাটি মক্কী। ইমাম সুয়ূতী বলেন, সবচেয়ে বেশী পরিচিত কথা যে, এটা মক্কী সূরা। কিন্তু হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাসমূহ এই ঃ

ইবনে আবু হাতিম আবু বুরাইদা'র বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, বনী হারিসা ও বনীল হারস্ নামক আনসারদের দুটো গোত্র প্রসংগে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। উভয় গোত্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করলো। পরে কবরস্তানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মরে যাওয়া লোকদের গৌরবগাঁথা পেশ করলো। এই ব্যাপার উপলক্ষ্যেই আল্লাহর কালাম الهاكم التكاثر নাযিল হয়েছে। কিন্তু সূরা বা আয়াতের নাযিল হবার উপলক্ষ পর্যায়ে সাহাবী ও তাবেঈনদের যে নীতি রয়েছে সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে বরং বলা যেতে পারে এই গোত্রদ্বয়ের এই ব্যাপারের সঙ্গে এ সূরার কথাগুলোর বেশ মিল আছে।

ইমাম বুখারী ও ইব্নে জরীর হযরত উবাই ইব্নে কা'ব-এর এ কথাটা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'আদম সন্তান যদি দু' উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পায়, তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা পেতে চাইবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিস দিয়েই ভরতে পারে না।' নবী করীমের (সঃ) এ কথাটা আমরা প্রথমে কুরআনের অংশ মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত الهاكم التكاثر নাযিল হলো।

এ হাদীসটির ভিত্তিতে সূরা তাকাসুরকে মাদানী সূরা মনে করা হয়। কেননা হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হযরত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম উপরোক্ত হাদীসটিকে কোন অর্থে কুরআনের অংশ মনে করতেন, তা হযরত উবা'ইর উপরোক্ত কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় না। এর অর্থ যদি এই হয় যে, তাঁরা একে কুরআনের একটা আয়াত মনে করতেন, তাহলে বলবো, এ কথা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অধিকাংশ সাহাবীই কুরআনের এক একটা অক্ষরের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা এ হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মত মারাত্মক ভুল করবেন তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। মূলত এ একটা অসম্ভব কথা। আর তার কুরআনের অংশ হবার অর্থ যদি এই হয় যে, এটা কুরআন হতে গৃহীত ও কুরআনের মৌল ভাবধারার সঙ্গে এর মিল আছে, তা হলে হযরত উবাই'র কথার অর্থ এও হতে পারে যে, মদীনায় যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা নবী করীমের (সঃ) মুখে এ সূরাটি শুনে মনে করেছিলেন যে, এটা এখনি নাযিল হয়েছে। আর নবী করীমের (সঃ) পূর্বোদ্ধৃত কথাটা এ সূরা হতেই গৃহীত বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল।

ইবনে জরীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দীসগণ হযরত আলীর (রাঃ) একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা কবরের আযাব সম্পর্কে সবসময় সন্দেহের মধ্যে পড়েছিলাম- শেষ পর্যন্ত

আল্‌হাকুমুত্ তাকাসুর নাযিল হলো। এই কথাটিকে সূরা 'তাকাসুর'-এর মাদানী হবার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। কেননা কবরের আযাবের উল্লেখ মদীনাতেই হয়েছিল। মক্কায় হিযরতের পূর্বে এর কোন উল্লেখ হয়নি। কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের সূরাসমূহের বহু স্থানে কবরের আযাবের উল্লেখ রয়েছে এবং তা এতই স্পষ্ট যে, তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। সূরা আল-আনআম-৯৩ নম্বর আয়াত, নহল-২৮ নম্বর, আল-মুমিনূন-৯৯-১০০ নম্বর, আল-মুমিন ৪৫-৪৬ নম্বর আয়াতসমূহ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সবকটি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। কাজেই হযরত আলীর (রাঃ) কথা হতে শুধু এতটুকুই বুঝা যায় যে, এ ক'টি মক্কী সূরার নাযিল হবার পূর্বেই সূরা 'তাকাসুর' অবতীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর কবরের আযাব সম্পর্কে সাহাবীদের আর কোন সন্দেহ থাকলো না।

এ কারণে এসব হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসীর এ সূরাটি মক্কী হবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। আর তাই সূরা 'তাকাসুর' কেবল যে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা তাই নয়, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য এবং এর বাচনভংগী হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ দুনিয়া পূজা ও বৈষয়িক দৃষ্টিভংগীর ফলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেশী ধন-সম্পদ, বৈষয়িক স্বার্থ ও স্বাদ-সুখ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করতে সচেষ্ট থাকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে সকলকে ছেড়ে আগে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় মেতে যায়। এসব জিনিস লাভ করে গৌরব-অহংকার করতে থাকে। এই একক চিন্তা মানুষকে এতই তন্ময় ও মশগুল করে রাখে যে, এটা হতে উর্ধের কোন জিনিসের দিকে লক্ষ্য দেয়ার একবিন্দু হুঁশই কারো থাকে না। এ অবস্থার মর্মান্তিক পরিণতি হতে সাবধান করাই এ সূরাটির উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, এখানে তোমরা যে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এ নি'আমতসমূহকে একত্রিত করছো, এটা কেবল সুখ, স্বাদ ও আনন্দ ভোগের নি'আমতই নয়, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রীও এটা। এর প্রত্যেকটি নি'আমত সম্পর্কে তোমাদেরকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

এক তার রুকু   মক্কী তাকাসুর সূরা   আট তার আয়াত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوۡفَ

তোমাদের গাফিল করে রেখেছে — অধিক প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা — যতক্ষণ না — তোমরা উপস্থিতহও — কবরসমূহে — কক্ষণও না — শীঘ্রই

تَعۡلَمُوۡنَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ④ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ

তোমরা জানবে — আবার (শুন) — কক্ষণই না — শীঘ্রই — তোমরা জানবে — কক্ষণই না — যদি — তোমরা জানতে

عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِ ⑦

জ্ঞানে — প্রত্যয় — অবশ্যই দেখবে তোমরা — দোযখ — আবার (শুন) — তা অবশ্যই তোমরা দেখবে — চোখে — প্রত্যয়

ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ ⑧

পরে — তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবেই — সে দিন — সম্পর্কে — নিয়ামতসমূহ

সূরা আত-তাকাসুর [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৮ মোট রুকু ঃ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. তোমাদিগকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ ও সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

২. ...এমন কি (এই চিন্তায়ই) তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হও।

৩. কক্ষণ-ই নয়। অতি শীঘ্রই [১] তোমরা জানতে পারবে।

৪. আবার (শুন), কক্ষণ-ই নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৫. কক্ষণ-ই নয়। তোমরা যদি নিঃসন্দেহ জ্ঞান হিসেবে (এই আচরণের পরিণতি) জানতে (তা হলে তোমরা এরূপ আচরণ কখনই করতে না)।

৬. তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখবে।

৭. আবার (শুন), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে তাকে দেখতে পাবে।

৮. পরে সেদিন তোমাদের নিকট এসব নি'আমত সম্পর্কে অবশ্যই জবাব চাওয়া হবে।

১। এখানে 'অতিশীঘ্রই' অর্থ পরকালও হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে, কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে-যে সব লিপ্ততা ও ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজের সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছে তা তার সৌভাগ্যের কারণ ছিল, না তার দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণতির কারণ।

সূরা আল-আসর

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ العصر কেই এর নাম বানানো হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল প্রমুখ এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক তফসীরকার একে 'মক্কী সূরা' বলেছেন। এর বিষয়বস্তুও সাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এ সময় খুব ছোট ও সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী বাক্যে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা পেশ করা হতো। ফলে তা একবার শুনে নেয়ার পর স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে যেতো এবং ভুলে যেতে চাইলেও তা কেউ ভুলতে পারতো না। তা স্বতস্ফূর্তভাবে লোকদের মুখে লেগে থাকতো ও সহজেই পঠিত হতো। বর্তমান সূরাও ঠিক এ গুণ নিয়ে অবতীর্ণ। কাজেই এর মক্কী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ ব্যাপক অর্থবোধক ও সংক্ষিপ্ত বাক্য সম্বলিত কালামের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এতে কয়েকটা ছোট ছোট শব্দে অর্থ ও ভাবের এক মহাসমুদ্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এর এই বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে বর্ণনা করার জন্য একটা পূর্ণ গ্রন্থও যথেষ্ট হবে না। বস্তুত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি, কোনটি ধ্বংস ও চরম বিপর্যয়ের উন্মুক্ত পথ-এ সূরায় তা স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেঈ সত্যই বলেছেন, মানুষ যদি এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করে ও পুরোপুরি বুঝে নিতে পারে, তাহলে তাদের হেদায়াতের জন্য এটাই যথেষ্ট। সাহাবা-ই-কিরামের দৃষ্টিতে এ সূরাটির খুব বেশী গুরুত্ব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিসন দারেমী আবু মাদীনা একটি বর্ণনায় বলেছেন, রসূলের (সঃ) কোন দু'জন সাহাবী যখন পরস্পরের সংগে মিলিত হতেন তখন একজন অপরজনকে সূরা আল-'আসর' না শুনিয়ে তারা কখনো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতেন না (তাবরানী)। সাহাবীদের নিকট এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল এ কথা হতে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

এক তার রুকু মক্কী আসর সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

শপথ কালের নিশ্চয় মানুষ রয়েছে অবশ্যই মধ্যে ক্ষতির (তাদের) ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

আমল করেছে নেকীর এবং উপদেশ দিয়েছে পরস্পরে হকের ও উপদেশ দিয়েছে পরস্পরে সবরের

সূরা আল-আসর

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. কালের শপথ১

২. মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত

৩. সে লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্ উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যধারণের উৎসাহ দিয়াছে।

১। 'কাল'-এর অর্থ অতীত কাল এবং চলমান বর্তমান কালও। 'কাল-এর শপথ'-এর অর্থ ইতিহাসও সাক্ষী এবং এখন যে সময় চলমান রয়েছে তাও সাক্ষ্য দান করছে যে, -যে কথা এর পর বর্ণনা করা হচ্ছে তা সত্য ও সঠিক।

সূরা আল হুমাযাহ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের همزة শব্দটিকেই এর নাম বানানো হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সমস্ত তফসীরকারই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরন্তু এর বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী বিবেচনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কীজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

ইসলাম-পূর্বকাল জাহেলিয়াতের যামানায় আরব সমাজে অর্থপূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ক্রটি ও দোষ বর্তমান ছিল। এই সূরায় তারই বীভৎসতা ব্যক্ত করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই জানতো যে, তাদের সমাজে এ দোষগুলো সত্যিই বর্তমান রয়েছে। ঐগুলোকে তারা সকলেই খারাপ মনে করতো। তাকে কেউই ভালো মনে করতো না। এ ঘৃণ্য স্বভাবের প্রতিবাদ করার পর এ স্বভাবের লোকদের পরকালীন পরিণামের কথা বলিষ্ঠ ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে এ ঘৃন্য স্বভাব এবং অপরদিকে তাদের পরকালীন পরিণাম এ দুটো কথাই সূরায় এমন ভংগীতে বলা হয়েছে যে, এরূপ চরিত্রের এরূপ পরিণতি হওয়াকে শ্রোতা মাত্রের নিকট স্বতঃই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। যেহেতু এরূপ স্বভাবের লোকদের সাধারণত দুনিয়ায় কোন শাস্তিই হয় না। বরং তারাই এখানে 'আংগুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে ওঠে এবং ফুলে-ফলে ও শাখা-প্রশাখায় ক্রমশ বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধই হয়ে থাকে। এ কারণে পরকাল অনুষ্ঠিত হওয়া অকাট্যভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা, তা না হলে এই লোকদের বিচার কোন দিনই হতে পারবে না।

সূরা আল যিল্যাল হতে বর্তমান সূরা পর্যন্ত চলে আসা ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে এ সূরাটি সম্পর্কে বিবেচনা করলে আর একটা কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মক্কার প্রাথমিক যুগে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং তার নৈতিক আদর্শ ও শিক্ষা-দীক্ষাকে তখনকার অবস্থায় কিভাবে লোকদের মন-মগজে বসানো হতো, এ হতে তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। সূরা 'যিলযাল'-এ বলা হয়েছে, পরকালে মানুষের পূর্ণাঙ্গ আমলনামা মানুষের সামনে পেশ করা হবে। দুনিয়ায় করা এক বিন্দু আমলও,তা নেক আমল হোক কি বদ আমল- তার নিকট উপস্থিত হওয়া হতে বাদ পড়ে যাবে না। সূরা আল-আদিয়াত-এ তদানীন্তন আরবের সর্বত্র বিরাজিত ব্যাপক ও মারাত্মক লুটতরাজ, মারামারি, রক্তপাত ও জোর-জবরদস্তির মোটামুটি বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাতে আল্লাহর দেয়া শক্তি-সামর্থ এরূপ অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় কাজে ব্যয় করাকে আল্লাহর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ব্যাপার এ দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে যাবে না। মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবনে তোমাদের কেবল বাহ্যিক কাজেরই নয়, তোমাদের নিয়ত ও মন-মানসিকতারও যাচাই-পরখ করা হবে। সেখানে কোন্ লোক কি ধরনের ব্যবহার পাবার যোগ্য, তা তোমাদের আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। সূরা আল ক্বারিয়াহ্'য় কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র পেশ করার পর লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পরকালে তাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হলো, না হালকা হলো এরই ভিত্তিতে সেদিন তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত

ফয়সালা গ্রহণ করা হবে। সূরা আত-তাকাসুর-এ বস্তুবাদী মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগীর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এরই দরুন মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আয়েশ-আরাম ও মান-মর্যাদা বেশী বেশী অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশী দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় এ চেষ্টায় দিনরাত তন্ময় হয়ে থাকে। অতঃপর এই তন্ময়তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই দুনিয়া কোন লুঠতরাজের ক্ষেত্র নয়, তাতে যথেচ্ছাভাবে লুটতরাজ চালিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নেই। এখন তোমাদেরকে যে যে নি'আমত দেয়া হয়েছে। তার এক একটি সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তা তোমরা কিভাবে ও কোন্ পথে উপার্জন করেছ এবং কিভাবে ব্যয় ও ব্যবহার করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে। সূরা আল আসর-এ অকাট্যভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান ও নেক আমল না হলে এবং সমাজের লোকেরা পরস্পরকে হকের নসীহত ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়ার কাজ সাধারণ পর্যায়ে না করলে এক এক ব্যক্তি, এক একটি সমাজ, এক একটি জাতি-সমগ্র মানব জাতি কঠিন ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে বাধ্য। এভাবে সূরা 'হুমাযাহ্' তে সে সময়ে জাহেলী সমাজের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের নমুনা পেশ করে প্রকারান্তরে লোকদের নিকট এ প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে যে, এ ধরনের স্বভাব-চরিত্রের পরিণামে ধ্বংস ও ক্ষতি হবে না কেন?

এক তার রুকু — মক্কী হুমাযাহ্ সূরা — নয় তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَيْلٌ	لِّكُلِّ	هُمَزَةٍ	لُّمَزَةٍ ①	الَّذِيْ	جَمَعَ	مَالًا	وَّ	عَدَّدَهٗ ②
ধ্বংস	জন্যে প্রত্যেক	সামনে নিন্দা কারীর	পিছনে দোষ প্রচারকারীর	যে	জমা করেছে	মাল	এবং	তা গণনা করে রেখেছে

يَحْسَبُ	اَنَّ	مَالَهٗٓ	اَخْلَدَهٗ ③	كَلَّا	لَيُنْۢبَذَنَّ	فِي	الْحُطَمَةِ ④	وَ
সে মনে করে	যে	তার মাল	তাকে চিরস্থায়ী করবে	কক্ষণ না	সে নিক্ষিপ্ত হবে অবশ্যাই	মধ্যে	বিচূর্ণকারী স্থানের	এবং

مَآ	اَدْرٰىكَ	مَا	الْحُطَمَةُ ⑤	نَارُ	اللّٰهِ	الْمُوْقَدَةُ ⑥	الَّتِيْ	تَطَّلِعُ
কি	তুমি জান	কি	বিচূর্ণকারী স্থান	আগুন	আল্লাহর	(যে আগুন) উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত	যা	পৌঁছে যাবে

عَلَى	الْاَفْـِٕدَةِ ⑦	اِنَّهَا	عَلَيْهِمْ	مُّؤْصَدَةٌ ⑧	فِيْ	عَمَدٍ	مُّمَدَّدَةٍ ⑨
উপর	অন্তরসমূহের	নিশ্চয়ই তা	তাদের উপর	অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে	মধ্যে	স্তম্ভসমূহের	দীর্ঘায়িত

সূরা আল-হুমাযাহ্ [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৯, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পিছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত।

২. যে লোক ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তাহা গুনে গুনে রেখেছে,

৩. সে মনে করে যে, আর ধন-মাল চিরকাল তার নিকট থাকবে১।

৪. কক্ষণ-ই নয়। সে ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।

৫. আর তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি ?

৬-৭. আল্লাহর আগুন, প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে।

৮. নিশ্চয়ই তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

৯. (এমতাবস্থায় যে, তারা) উচু-উচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে ২)।

১। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে- সে মনে করে তার ধন-সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে, সে কখনও এ চিন্তাও করেনি যে- এমন এক সময় আসবে যখন এসব কিছু ত্যাগ করে তাকে দুনিয়া থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হবে।

২। 'ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ'-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ ১. জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তার উপর উঁচু উঁচু স্তম্ভ প্রোথিত করে দেয়া হবে, ২. অপরাধীগণকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সংগে আবদ্ধ করা হবে, ৩. জাহান্নামের আগুনের শিখা-দীর্ঘ সুউচ্চ স্তম্ভের রূপে উর্ধ্বে উত্থিত হবে।

সূরা আল-ফীল

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اصحب الفيل বাক্যাংশের الفيل শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী হওয়ার ব্যাপারটি সর্বসম্মত। এর ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয়, এই সূরাটিও সম্ভবত মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাজরানে ইয়েমেনের ইহুদী শাসক যু-নাওয়াস হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ওপর যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ স্বরূপ হাবশার (আবিসিনিয়ার) খৃস্টান সরকার ইয়েমেনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হেমইয়ারী সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এভাবে ৫২৫ খৃস্টাব্দেই এ সমগ্র অঞ্চলের উপর হাবশীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত কার্যকলাপ মূলত কনস্টান্টিনোপলের রোমান সরকার ও হাবশী সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা, সেকালে হাবশীদের নিকট কোন উল্লেখযোগ্য নৌ-শক্তি বর্তমান ছিল না। রোমানরা এ নৌ বাহিনী গঠন করে এবং হাবশা তারই সাহায্যে নিজের ৭০ হাজার সৈন্য ইয়েমেনের উপকূলে নামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সব ব্যাপার বুঝার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া আবশ্যক যে, এসব কিছু শুধু মাত্র ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছাসের কারণেই করা হয়নি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও এর পিছনে প্রবলভাবে কাজ করছিল। বরং তাই বোধ হয় এর আসল কার্যকরণ। আর খৃস্টান নির্যাতিতদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটা বাহানা মাত্র। এর অধিক কিছুই নয়। রোমান সাম্রাজ্য যে সময় হতে মিসর ও সিরিয়া অধিকার করেছিল, সে সময় হতেই তারা এ জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে এসেছিল। পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ ও রোমান অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে চলিত ব্যবসায়ের ওপর শত শত বছর ধরে আরবদের কর্তৃত্ব চলে আসছিল। আরবদের অধিকার হতে তা মুক্ত করে নিজেদের দখলে নিয়ে আসাই ছিল তার আসল লক্ষ্য। কেননা, এ ব্যবসায়ে যে বিপুল মুনাফা অর্জিত হয়, আরব ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতা শেষ হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ তাদেরই করায়ত্ত হতে পারে এ উদ্দেশ্যে খৃস্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ সনে কাইজার আগস্টস রোমান জেনারেল ইলিয়স গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটা বিরাট বাহিনী আরবের পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণ আরব হতে সিরিয়া পর্যন্ত অবস্থিত সমুদ্র পথ দখল করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু আরবের কঠিন রুক্ষ ভৌগোলিক অবস্থা এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। তখন কেবলমাত্র স্থলপথই তাদের জন্য উন্মুক্ত থেকে যায়। আর এ স্থল পথকেও দখল করার উদ্দেশ্যে তারা হাবশার খৃস্টান সরকারের সংগে যোগসাজশ করে এবং নৌবাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করে তার দ্বারা ইয়েমেন অধিকার করায়। ইয়েমেনের ওপর যে হাবশী সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। ঐতিহাসিক হাফেয ইব্‌নে কাসীর লিখেছেন, এ বাহিনী দু'জন সেনাধ্যক্ষের অধীন ছিল। একজনের নাম ছিল আরইয়াত, আর দ্বিতীয় জনের নাম আবরাহা। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বর্ণনা রেছেন, বাহিনীর মূল সেনাধ্যক্ষ ছিল আরইয়াত। আর আবরাহা ছিল সে বাহিনীর মধ্যে শামিল একজন যোদ্ধা। অবশ্য এ দু'জন ঐতিহাসিকই একমত হয়ে লিখেছেন যে, পরে আবরাহা ও 'আরইয়াত'-এর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বেধে যায়। শেষে রইয়াত নিহত হয় এবং আবরাহা গোটা দেশ দখল করে বসে। পরে সে নিজেকে ইয়েমনে হাবশা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে মেনে নবার জন্য হাবশা সম্রাটকে রাজী করে নেয়।

কিন্তু গ্রীক ও সুরয়ানী ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। তারা বলেন, ইয়েমেন বিজয়ের পর যখন হাবশীরা প্রতিরোধকারী ইয়েমেন সরদারদের সকলকে এক একজন করে হত্যা করতে শুরু করলো, তখন তাদের মধ্য হতে আস্ সুমায়ফে আশওআ নামক একজন সরদার (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম লিখেছে Esymphacus) হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে ও জিযিয়া দেয়ার চুক্তি করে হাবশা সম্রাটের নিকট হতে ইয়েমেনের গবর্নর পদের নিয়োগপত্র লাভ করে বসলো। কিন্তু হাবশী সেনারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং আবরাহাকে তার স্থানে গবর্নর বানিয়ে দিল। এ ব্যক্তি ছিল হাবশার সামুদ্রিক বন্দর আদুলিস-এর এক গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। সে তার নিজেরে যোগ্যতা বলে ইয়েমেনদখলকারী হাবশী সৈন্যদের ওপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে যে সৈন্যবাহিনী পাঠায়, হয় তারা তার সাথে মিলিত হয়, নতুবা সে তাদেরকে পরাজিত করে। হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী আবরাহাকে ইয়েমেন নিজের প্রতিনিধি শাসকরূপে মেনে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এ প্রতিনিধি শাসকের নাম লিখেছেন Abrahmes, আর সুরয়ামী ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন Abraham। আর আবরাহা সম্ভত এরই হাবশী উচ্চারণ। কেননা আরবী ভাষায় এ নামের উচ্চারণ হলো 'ইবরাহীম'।

এ ব্যক্তি ক্রমশ ইয়েমেনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। হাবশী সম্রাটের প্রাধান্য সে স্বীকার করতো নামেমাত্র। নিজেকে সে 'সম্রাট প্রতিনিধি' বলেই পরিচিত করতো। সে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। একটা ঘটনা হতেই সে বিষয়ে ধারণা করা চলে। ৫৪৩ খৃস্টাব্দে সে মায়ারিব্ প্রাচীরের মেরামতের কাজ শেষ করার পর এক বিরাট উৎসব উদযাপন করলো। রোমের কাইজার, ইরান সম্রাট, হীরা-সম্রাট ও গাস্সান সম্রাটের প্রতিনিধিবৃন্দ এ উৎসবে যোগদান করে। সদ্দে-মায়ারিবে তার লাগানো শিলালিপিতে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজ পর্যন্ত তা বর্তমান ও অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। GLASER এটা উদ্ধৃত করেছেন।

ইয়েমেনে নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে নেবার পর আব্রাহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজ করতে শুরু করলো। এ অভিযানের গোড়া হতেই রোমান সাম্রাজ্য এবং তার মিত্র হাবশী খৃস্টানদের সামনে সেই উদ্দেশ্যই বর্তমান ছিল। আর তা হলো একদিকে আরব দেশে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করা, আর অন্য দিকে প্রাচ্য দেশসমূহ ও রোমান অধিকৃত অঞ্চলের মাঝে আরবদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় করায়ত্ত করা। বিশেষত ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমানদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে রোমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে উক্ত উদ্দেশ্য লাভ তরান্বিত করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমনের রাজধানী সানায় একটা গীর্জা নির্মাণ করলো (আরব ঐতিহাসিকগণ তার নাম লিখেছেন 'আল-কাশীস' কিংবা আল-কুলাইস অথবা 'আল-কুল্লাইস'। এ শব্দটি গ্রীক শব্দ EKKLESIA'র আরবীকরণ)। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্নে ইস্হাক বর্ণনা করেছেন, এই কাজটি সুসম্পন্ন করার পর সে হাবশা সম্রাটকে লিখলো যে, আমি আরবদের হজ্জ অনুষ্ঠান কা'বা হতে এ গীর্জায় স্থানান্তরিত না করে ছাড়বো না। ঐতিহাসিক ইব্নে কাসীর লিখেছেন, ইয়েমেন সে তার এ ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল এবং চারদিকে এ কথা ঘোষণা করায়।*আমাদের মতে তার এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল আরবদের রাগান্বিত করে তোলা। কেননা তারা রাগান্বিত হয়ে যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে তাকে একটা উপলক্ষ্য বানিয়ে সে মক্কার উপর আক্রমণ চালাবার ও কা'বা শরীফ বিধ্বস্ত করার সুযোগ পাবে। মুহাম্মদ ইব্নে ইস্হাক এও লিখেছেন যে, আবরাহার উক্তরূপ ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন না কোনরূপে গীর্জায় প্রবেশ করে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। ইব্নে কাসীরের বর্ণনা মতে, জনৈক কুরাইশ এ কাজ করেছিল। আর মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের কতিপয় যুবক মিলিত হয়ে এ গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ধরনের ঘটনা যদি আদৌ ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তা যেমন অস্বাভাবিক ও অকারণ কিছু নয়, তেমনি নয় বিস্ময়কর কিছু। কেননা, আবরাহার উক্ত ঘোষণাই ছিল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। ফলে প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে কোন আরব কিংবা কুরাইশ

*ইয়েমেনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা কা'বার প্রতিকূলে অপর এক কা'বা নির্মাণের জন্যে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল। আরবেই তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা কায়েম করতে চেয়েছিল। এ কারণে নাজরানেও একটা কা'বা বানিয়েছিল।

ব্যক্তি অথবা কতিপয় যুবকের উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে অপবিত্র করে দেয়া কিংবা তাতে আগুণ ধরিয়ে দেয়া কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আরো একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আবরাহা নিজেই হয়তো নিজের কোন লোক দ্বারা এরূপ কাজ করিয়েছিল। কেননা, একে ছুতা বানিয়ে সে সহজেই মক্কার ওপর আক্রমণ চালাতে পারতো এবং কুরাইশকে ধ্বংস করে ও সমগ্র আরবকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের দুটো উদ্দেশ্যই সে একসংগে লাভ করতে পারতো। সে যাই হোক, কা'বা ভক্তরা তার নির্মিত গীর্জার অপমান করেছে বলে আবরাহা যখন রিপোর্ট পেল, তখন সে কা'বা বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত একবিন্দু স্থির হয়ে বসবে না বলে শপথ বা কসম করে বসলো।

অতপর আবরাহা ৫৭০ বা ৫৭১ খৃস্টাব্দে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতি (কোন কোন বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। পথে প্রথমে ইয়েমেনের যুনফর নামক জনৈক সরদার আরবদের একটা বাহিনী নিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু সে পরাজয় বরণ করে ও ধৃত হয়। তারপর খাশআম অঞ্চলে নুফাইল ইব্‌নে হাবীব খাশআমী নামক জনৈক আরব গোত্রপতি নিজের গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহা বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু সেও পরাজিত হয় এবং গ্রেফতার হয়। সে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার পথ প্রদর্শকের কাজ গ্রহণ করে। তায়েফের নিকটে পৌছলে বনু সকীফ এত বড় শক্তির সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারবে না মনে করে পিছনে হটে গেল। আবরাহা যাতে এদের মাবুদ 'লাত'-এর মন্দির ধ্বংস করে না দেয় তাদের মনে এ ভয় জাগলো। এ কারণে তাদের মাসউদ নামক জনৈক সরদার একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। বললো, আপনি যে উপাসনা কেন্দ্র ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসেছেন, তা আমাদের উপাসনালয় নয়। আপনার লক্ষ্যস্থল তো মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদের উপাসনালয়ের ওপর আক্রমণ করবেন না। আমরা আপনাকে মক্কার পথ দেখাবার জন্য লোক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। বনু সকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে আবরাহার সংগে পাঠিয়েছিল। মক্কায় পৌছতে যখন ত্রিশ ক্রোশ পথ বাকি ছিল, তখন আল-মুগাম্মাস (অথবা আল মুগাম্মিস) নামক স্থানে আবু রিগাল মরে গেল। আবরাহাকে পথ প্রদর্শন করা ছিল তার একটা জাতীয় অপরাধ। তাই আরব জাতির জনগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। বনু সকীফের লোকেরা যে নিজেদের মাবুদ 'লাতের' মন্দির রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, সে জন্যও আরববাসীরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক লিখেছেন, আল-মুগাম্মাম নামক স্থান হতে আবরাহা তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে আগে পাঠিয়ে দিল। এরা তোহামা অধিবাসী ও কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুট করে নিয়ে গেল। নবী করীমের (সঃ) দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শ উট তারা নিয়ে যায়। আবরাহা একজন দূতের মাধ্যমে মক্কার লোকদের নিকট পয়গাম পাঠাল- আমি তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমরা যদি লড়াই করতে সম্মুখে এগিয়ে না আস, তাহলে তোমাদের জান-মাল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে। মক্কার সরদাররা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা আবরাহার সঙ্গে দেখা করতে পারে, এ কথাও দূতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। এ সময় মক্কার প্রধান সরদার ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। দূত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ পয়গাম পৌছালে তিনি বললেন, আবরাহার সঙ্গে লড়াই করার কোন শক্তি আমাদের নেই। কা'বা তো আল্লাহর ঘর, তিনি চাইলে তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বললো, আপনি আমার সংগে চলুন আবরাহার সাথে দেখা করবেন। তিনি এতে রাযি হলেন ও দেখা করতে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব অতিশয় সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। আবরাহা তাঁকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তাঁর পাশে বসলো। জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বললো, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোন মর্যাদা থাকলো না। কেননা, আপনি নিজের উটগুলো ফেরত নিতে চাইলেন, কিন্তু আপনারও আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার ব্যাপারে আপনি কোন কথাই বললেন না। তিনি বললেন আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট দরখাস্ত করতে এসেছি।

এ ঘরের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এর একজন রব আছেন। তিনি নিজে এর হেফাযত করবেন। আবরাহা বললোঃ সে আমার আঘাত হতে এ ঘরকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ এ ব্যাপারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও জানেন আর তিনিও (এই ঘরের মালিক)। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে চলে এলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিল।

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে- এ বর্ণনায় উটের দাবি করার কোন উল্লেখ নেই। 'আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু-নায়ীম ও বায়হাকী তার সূত্রে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, আবরাহা যখন আস-সিফাহ নামক স্থানে উপস্থিত হন (আরাফা ও তায়েফের মাঝখানে পর্বতমালার মাঝে ও হারামের সীমার মধ্যে এ স্থানটি অবস্থিত), তখন আবদুল মুত্তালিব নিজে তার কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনার নিজের এ পর্যন্ত আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের আবশ্যক হয়ে থাকলে আমাদেরকে বলে পাঠাতেন, আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে হাজির হতাম। সে বললো. আমি শুনেছি এটা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর এ শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করে দেয়ার জন্য এসেছি। 'আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত এর ওপর তিনি কাকেও চড়াও হতে দেননি'। আবরাহা উত্তরে বললোঃ 'আমরা একে বিধ্বস্ত না করে ফিরে যাবো না।' 'আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা সে কথা মানতে অস্বীকার করলো ও 'আবদুল মুত্তালিবকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংগের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিল।

উভয় বর্ণনার এ পার্থক্য যদি আমরা যথাযথভাবে মেনে নিই এবং কোনটিকে কোনটির ওপর অগ্রাধিকার না দিই, তা হলে প্রকৃত অবস্থা যাই হয়ে থাকুক না কেন, একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে তা এই যে, মক্কা ও তার আশে-পাশের গোত্রসমূহের আবরাহার এত বড় সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করে কাবা শরীফ রক্ষা করা বিন্দুমাত্র সম্ভব ছিল না। কাজেই কুরাইশরা যে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করতেও চেষ্টা করেনি তা সুস্পষ্ট। কুরাইশরা আহযাব যুদ্ধকালে মুশরিক ও ইহুদী গোত্রসমূহ মিলিয়ে সর্বমোট মাত্র ১০-১২ হাজার লোকের একটি বাহিনী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময় আবরাহার ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট সুগঠিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে তারা কিভাবে সক্ষম হতে পারতো?

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকান্ড হতে বাঁচবার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের আরো কতিপয় সরদারকে সংগে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের রক্ষা করেন। এই সময় কা'বার মধ্যে ৩৬০টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ কঠিন সময়ে তাদের কথা তাদের স্মরণে আসেনি। তারা কেবল আল্লাহর দরবারেই সাহায্যের জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে দিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের এ সময়কার দো'আসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। এ দো'আয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। ইবনে হিশাম তাঁর "সীরাত" গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাসমূহের উল্লেখ করেছেন ঃ

لَاهُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رِحْلَهٗ فَامْنَعْ رِحَلاً لَكَ

لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ وَ مِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكَ

اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ وَقِبْلَتَنَا فَاَمْرٌ مَا بَدَالَكَ

-'হে খোদা বান্দাহ নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে
তুমিও রক্ষা কর তোমার নিজের ঘর।

কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন তোমার ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় জয়ী হতে না পারে। তুমি যদি তাদেরকে ও আমাদের কেবলা-ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চাও, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর'।

সুহাইলী রওযুল উনুফ গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وَانْصُرْنَا عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ وَعَابِدِيْهِ اَلْيَوْمَ اٰلَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মুকাবিলায় আজ তোমার আপন পক্ষের লোকদেরকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ
ইব্‌নে জরীর আবদুল মুত্তালিবের দো'আ প্রসংগে পড়া নিম্নোক্ত কবিতা ছত্র দুটোরও উল্লেখ করেছেন ঃ

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْلَهُمْ سِوَاكَا يَارَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَ اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُّخَرِّبُوْا قِرَاكَا

-হে আমার রব এ লোকদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোন আশা রাখি না।
হে আমার রব তাদের হতে তুমি তোমার হেরেমের হেফাযত কর।
এ ঘরের শত্রু তোমারও শত্রু। তোমার জনবসতি ধ্বংস করা হতে এদেরকে বিরত রাখ।"

আল্লাহর নিকট এসব দো'আ করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু নিজের হাতি যা সকলের অগ্রভাগে চলছিল-সহসা বসে পড়লো। হাতিটিকে খুব থাপড়ানো হলো, চাবুক দিয়ে মারা হলো এবং মারতে মারতে তাকে আহত করা হলো, কিন্তু তবুও তা একবিন্দু নড়লো না। তাকে দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব দিকে ঘুরিয়া চালাতে চেষ্টা করলে তা দৌড়াতে শুরু করতো। কিন্তু মক্কার দিকে ফিরিয়ে চালাতে চেষ্টা করা হলে সংগে সংগে বসে পড়তো। তখন কোনক্রমেই সামনের দিকে চলতে প্রস্তুত হতো না। এ মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাখায় ও ঠোঁটে পাথর টুকরো নিয়ে উড়ে এলো এবং কা'বা আক্রমণকারী এই সৈন্য বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। যার ওপর এ পাথর কুচি পড়তো, তার দেহ তখনি বিগলিত হতে শুরু হতো। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক ও ইক্‌রামের বর্ণনা হলো- পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই দেহে বসন্ত শুরু হয়ে যেতো। আরব দেশসমূহে এ রোগের প্রাদুর্ভাব এ বৎসরই সর্বপ্রথম দেখা দেয়। ইব্‌নে আব্বাসের বর্ণনা হলো যারই ওপর পাথরকুচি পড়তো, সংগে সংগে তার দেহে ভয়ানক রকমের চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এ চুলকানীর ফলেই চামড়া ফেটে যেত ও মাংস খসে ঝড়ে পড়তে শুরু করতো। ইব্‌নে আব্বাসের অপর বর্ণনা মতে- দেহের মাংস ও রক্ত পানির মত ঝরতে শুরু করতো এবং হাড় বের হয়ে আসতো। স্বয়ং আব্‌রাহারও এ অবস্থা দেখা দিল। তার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে যেতে লাগলো। আর যেখানেই একটা একটা খন্ড পড়তো সেখান হতেই পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এরূপ অবস্থা দেখে নিরুপায় ও পাগলপারা হয়ে তারা ইয়েমেনের দিকে পালাতে লাগলো। খাশআম অঞ্চল হতে নুফাইল ইব্‌নে হাবীব খাশআমী নামক যে ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে সংগে নিয়ে এসেছিল, তাকে খুঁজে বের করে এনে বললো, ফেরত যাবার পথ দেখাও। কিন্তু সে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলো এবং বললো ঃ

اَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْاِلٰهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

-এখান হতে পালিয়ে যাবার স্থান কোথায় পাবে? আল্লাহ নিজেই যখন পশ্চাদ্ধাবন করছেন (তখন আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না)। আবরাহা নাক কাটা তো পরাজিত। সে কিছুতেই বিজয়ী হতে পারে না। পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে এরা নানা জায়গায় পড়ে মরতে লাগলো কিংবা মরে পড়তে লাগলো। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, এ লোকেরা সকলেই ঠিক সে সময়ই মরে শেষ হয়ে যায়নি। কিছু লোক তো সেখানেই ধ্বংস হলো। আর কিছু লোক পালিয়ে যাবার সময় পথের মধ্যে মরে পড়ে থাকলো। আবরাহা নিজে খাশআম অঞ্চলে পৌঁছে মারা গেল।*

আল্লাহতা'আলা হাবশীদের কেবল এ শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। অতঃপর তিন চার বছরের মধ্যে ইয়েমেন হতে হাবশী শাসনের অবসান করলেন। ইতিহাস হতে জানা যায়, এ হস্তি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ইয়েমেনে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল। দিকে দিকে ইয়েমনী সরদাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগলো। পরে সাইফ ইব্‌নে যী-ইয়াযান নামক জনৈক ইয়েমনী সরদার পারস্য সম্রাটের নিকট হতে সামরিক সাহায্য চাইলো। পারস্যের মাত্র এক হাজার সৈন্য শুধু ছ'টি জাহাজে এসেছিল এবং হাবশী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য এটাই যথেষ্ট হয়েছিল। এটা খৃষ্টীয় ৫৭৫ সনের ঘটনা :

এ ঘটনাটি হয় মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে মুহাসাব উপত্যকার নিকটে ও 'মুহাস্‌সির' নামক স্থানে। মুসলিম ও আবু দাউদ, হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা মতে, ইমাম যাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে- তিনি হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ হতে নবী করীমের (সঃ) বিদায় হজ্জের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) যখন মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চললেন, তখন মুহাস্‌সির উপত্যকায় চলার গতি তিনি খুব তীব্র করে দিলেন। ইমাম নববী তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হাতিওয়ালাদের ঘটনা ঠিক এ স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াই সুন্নাত। মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মুযদালিফা হলো পুরোপুরি অবস্থান করার জায়গা। কিন্তু মুহাস্‌সির উপত্যকায় অবস্থান করা উচিত নয়। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে সে এ ঘটনার চোখেদেখা বিবরণ দিয়েছে ঃ

رُدَيْنَةُ لو رَأيتِ وَلاَ تَرِيه   لَدى جنب المحصَّب مَا راينَا

حَمدتُ اللهِ اذَا بَصُرتُ طَيراً   وَخِفتُ حِجَارَةً تُلقى عَلَينَا

وكُلُّ القَومِ لِيسَالُ عَن نُفَيلٍ   كَأن عَلَىَّ لِلحَبشَانِ دَيْنَا

-হে রুদাইনা! তুমি যদি দেখতে- তুমি তো দেখতে পারবে না মুহাসাব উপত্যকার কাছে আমরা যা দেখেছি। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করেছি যখন আমি পাখীগুলো দেখেছি, আমি ভয় পাচ্ছিলাম পাথর আমাদের উপর না পড়ে। সে লোকদের সকলে নুফাইলকে খুঁজছিল। যেন আমার উপর হাবশীদের কোন ঋণ চেপেছিল।

এই ঘটনাটা ছিল একটা অসাধারণ বিস্ময়কর ব্যাপার। সমগ্র আরবে এ খবর অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। বহুসংখ্যক কবি এ জন্য বহু কবিতা রচনা করে। এ সময় রচিত সব কবিতায় একটি মূল সুর সাধারণভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এ ঘটনাটিকে প্রত্যেক কবিই নিজ নিজ কবিতায় আল্লাহতা'আলার বিশেষ অসাধারণ শক্তির এক অতি বড় প্রকাশ-'মুযিযা' বলে উল্লেখ করেছে। এ ব্যাপারে কা'বায় পূজিত দেব-দেবীদের এক বিন্দু হাত আছে সে কথা ইশারা-ইংগিতেও কোথাও বলা হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনিযযিবা'রীর কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

سِتُّونَ الفًا لَم يَؤُبُوا أرضَهُم   وَلَم يَعِش بعد الاياب سَقِيمُهَا

كَانَت بِهَا عَادٌ وَجُرهُم قَبلَهُم   وَاللهُ مَن فوق العباد يُقِيمُهَا

-ওরা ষাট হাজার ছিল, নিজেদের জন্মভূমির দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারলো না। ফিরে যাওয়ার পর তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আব্‌রাহা) জীবিতও থাকতে পারলো না।

তাদের পূর্বে এখানে 'আদ ও জুরহুম জাতির লোকেরা ছিল। আর আল্লাহ সব লোকের উপর বর্তমান। তিনিই এদেরকে রক্ষা করেন।

আবু কাইস ইবনে আস্লাফের কবিতা ঃ

فَقُومُوا فَصَلُّوا رَبَّكُم وَتَمَسَّحُوا   بار كان هذا البيت بين الاخاشب

فلما اتاكم نصرى ذى العرش ردهم   جنود المليك بين ساف وحاصب

'ওঠো ! তোমার রবের বন্দেগীতে লেগে যাও এবং মক্কা ও মিনার পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত আল্লাহর ঘরের স্তম্ভসমূহ স্পর্শ কর। আরশ অধিপতির সাহায্য যখন তোমাদের প্রতি এলো, তখন সেই বাদশাহর সৈন্য সামন্ত এই লোকদেরকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিল যে, কেউ ধুলায় লুন্ঠিত, আর কেউ পাথর নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

কথা এখানেই শেষ নয়। হযরত উম্মেহানী ও হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওআম বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কুরাইশরা ১০ বছর, কোন কোন বর্ণনা মতে ৭ বছরকাল এক ও লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করেনি। উম্মেহানীর বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ও তাবরানী, হাকেম ইব্‌নে মারদুইয়া ও বায়হাকী নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর হযরত যুবাইরের বর্ণনা তাবরাণী ইব্‌নে মারদুইয়া ও ইব্‌নে আসাকির উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে 'মুরসাল' বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তা হতে এর আরো সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় আরববাসীরা সে বছরটিকে 'হস্তি-বর্ষ' নামে অভিহিত করে। হযরত নবী করীমের (সঃ) পবিত্র জন্মও এ বছরই হয়। হাতি সংক্রান্ত ঘটনাটি মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে মুহাদ্দেসীন ও ইতিহাসবিদ্‌দের মাঝে কোন মতভেদ নেই। আর নবী করীমের (সঃ) জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। অনেকের মতে নবী করীমের (সঃ) জন্ম ঘটনা হাতি সংক্রান্ত ঘটনার ঠিক পঞ্চাশ দিন পরে সংঘটিত হয়।

মূল বক্তব্য

এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হলো, এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা 'ফীল' সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। এ সূরায় এত সংক্ষিপ্তভাবে হাতি সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে কেবলমাত্র হাতিওয়ালাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা এবং তাকেই যথেষ্ট মনে করা হলো কেন, তা এ ঐতিহাসিক পটভূমিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। তার কারণ এই যে, এ সূরাটি নাযিল হওয়াকালে হাতি সংক্রান্ত ঘটনা কিছু মাত্র পুরাতন হয়ে যায়নি। মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকটই এ ছিল একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সকলেই এটা জানতো। আরবের কোন ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাযতের এই কাজটি কোন দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এ নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ অবদান। কুরাইশ সরদাররা একমাত্র আল্লাহর নিকটই দো'আ ও প্রার্থনা করেছিল। পরে একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত কুরাইশ লোকেরা এ ঘটনা দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ কারণেই সূরা 'ফীল'-এ কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কেবল মাত্র ঘটনাটির উল্লেখ ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল, যেন এ উল্লেখের ফলেই বিশেষভাবে কুরাইশের লোকেরা এবং সাধারণভাবে আরববাসীরা নিজেদের মনে মনে চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বুদ পরিত্যাগ করে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সংগে এ কথাও যেন তারা ভেবে দেখে যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) এ সত্য দ্বীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ হাতিওয়ালাদেরকে তছনছ করে দিয়েছিলেন, তারা সেই আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে। সূরা 'আল-ফীল-এর মূল বক্তব্য হলো এটাই এবং এটাই হলো এর নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য।

رُكُوعُهَا ١	(١٠٥) سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ	اٰيَاتُهَا ٥
এক তার রুকু	মক্কী ফীল সূরা	পাঁচ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ① اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

নাই কি তুমিদেখ কেমন করেছেন তোমার রব ওয়ালাদের সাথে হাতী তিনি পর্যবসিত করে দেন নাই কি তাদের কৌশলকে

فِيْ تَضْلِيْلٍ ② وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

নিষ্ফলতার মধ্যে এবং পাঠিয়েছেন তাদের উপর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে (যা) তাদের উপর নিক্ষেপ করে পাথরসমূহকে

مِّنْ سِجِّيْلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

কংকরের অতঃপর করেদেন তাদেরকে যেমন ভূষি ভক্ষণ করা

সূরা আল-ফীল

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৫, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। তুমি কি দেখনি তোমার খোদা হস্তিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?

২। তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ?

৩-৪। আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠায়ে দিলেন যা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল?

৫। ফলে তাদের অবস্থা এমন করে দিল, যেমন (জন্তু-জানোয়ারের) ভক্ষণ করা ভূষি১।

১। রসূলুল্লাহের (সঃ) পুন্যময় জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে সংঘটিত এক বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইয়েমনের হাবশী রাজ্যের খৃষ্টান সম্রাট আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিযান করে। সৈন্যবাহিনীতে কয়েকটি হস্তিও ছিল। যখন তারা মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে তখন অকস্মাৎ সমুদ্রের দিক থেকে পক্ষী দল ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চু ও নখরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখন্ড নিয়ে এসে সৈন্যবাহিনীর উপর ব্যাপক প্রস্তরবর্ষণ শুরু করে। যার উপরই এই প্রস্তরখন্ড আপতিত হয় তার গাত্র-মাংস গলিত হয়ে খসে খসে পড়তে শুরু করে। এইভাবে সমগ্র সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। আরবে এ ঘটনা ছিল খুবই প্রখ্যাত এবং এই সূরা অবতীর্ণকালে পবিত্র মক্কানগরীতে এরূপ হাজার হাজার ব্যক্তি জীবিত বর্তমান ছিলেন, যাঁরা ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যাঁদের নিজেদের চোখের সামনেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সমগ্র আরববাসীগণও এ কথা স্বীকার করতো যে, হস্তীপতিদের (আবরাহা ও তার সৈন্যদল) এই ধ্বংস একমাত্র আল্লাহতা'আলার শক্তি-মহিমার কুদরতে সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা কুরাইশ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের قريش শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

দহ্হাক ও কল্‌বী এ সূরাটিকে মাদানী বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সীর এর মক্কী হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এর মক্কী হওয়ার বড় প্রমাণ হলো এ সূরারই رب هذا البيت এই ঘরের রব একথাটি, এ যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো তাহলে কা'বা ঘরকে এই ঘর বলে ইংগিত করা কিছুতেই শোভন হতে পারতো না। বস্তুত এ সূরার মূল কথা ও বক্তব্যের সঙ্গে সূরা 'ফীল'-এর মূল বিষয়বস্তুর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, উক্ত সূরা নাযিল হওয়ার পর-পরই ও সংগে সংগেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে স্পষ্ট ধারণা হয়। উভয় সূরার পারস্পরিক এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের কারণে কোন কোন মহান ব্যক্তি এতখানি বলেছেন যে, আসলে এ দুটি একই সূরা। কতিপয় হাদীসের বর্ণনা হতেও এ ধারণা বলিষ্ঠতা পেয়েছে। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের (নিকট রক্ষিত) মসহাফে এ দুটো সূরা এক সংগে লিখিত রয়েছে, দুটোর মাঝে 'বিসমিল্লাহ' লিখে পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর (রাঃ)ও একবার এ সূরা দুটোকে একসংগে মিলিয়ে পড়েছিলেন, এদের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। এসব কারণে একশ্রেণীর লোকের ধারণা হয়েছে যে, এ দুটো সূরা অভিন্ন। কিন্তু এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত উসমান (রাঃ) বিপুল সংখ্যক সাহাবীর বাস্তব সহযোগিতায় কুরআন মজীদের যেসব সংকলন সরকারীভাবে তৈরী করিয়ে ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এ দুটো সূরার মাঝে বিস্‌মিল্লাহ লেখা ছিল। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সব মসহাফে এ দুটো ভিন্ন ভিন্ন সূরা হিসেবে লিখিত হয়ে এসেছে। উপরন্তু উভয় সূরার বাচনভংগীও পরস্পর হতে এতই ভিন্ন ধরনের যে এ দুটো ভিন্ন ভিন্ন সূরা হওয়া অকাট্য ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরাটির সঠিক তাৎপর্য বুঝবার জন্য এর ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর উজ্জ্বল দৃষ্টি সংস্থাপন আবশ্যক। কেননা এ দিক দিয়েই এর বিষয় বস্তুর সাথে সূরা ফীল-এর বিষয়বস্তুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

নবী করীমের (সঃ) প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কেলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ বংশের লোক হেযাযে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কুসাই-ই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্রিত করে। আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী পদ এ গোত্রের হাতে আসে। এ কারণে কুসাইকে একত্রকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ ব্যক্তি স্বীয় উচ্চতম মানের ব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে মক্কা নগরে একটা নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। আরবের নানাদিক হতে আগত হাজীদের খেদমত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে আরবের সমস্ত গোত্র ও অঞ্চলের ওপর কুরাইশ বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হলো। কুসাই'র পর মক্কার নগর- রাষ্ট্রের পদসমূহ তার দুই পুত্র আবদে মনাফ-ও আবদুদ্দারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু উভয় পুত্রের মধ্যে আবদে মনাফ তার পিতার আমল হতেই সর্বাধিক

খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। সারা আরবে তার বিশেষ মর্যাদা সর্বজন-স্বীকৃত হয়েছিল। আবদে মনাফের চার পুত্র ছিল। হাশেম, আব্দে শাম্স, মুত্তালিব ও নওফাল।তার মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবেরপিতা ও নবী করীমের (সঃ)পিতামহ হাশিম সর্বপ্রথম ব্যবসায়-বানিজ্য মনোনিবেশ করেনআরবের পথে প্রাচ্যদেশ এবং সিরিয়া ও মিসরের মাঝে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বহুপূর্বকাল হতেই চলে আসছিল তাতে অংশগ্রহণের চিন্তা সর্বপ্রথম তার মনে জাগে। আর সে সংগে আরববাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাহির হতে ক্রয় করে আনার ইচ্ছাও জাগে। এর ফলে উক্ত দীর্ঘ পথের মাঝে অবস্থিত গোত্রসমূহ যেমন তাদের নিকট হতে পণ্যদ্রব্য খরিদ করবার সুযোগ পেতে পারে তেমনি মক্কার বাজারে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীরাও ক্রয়-বিক্রয় করবার জন্য এখানে যাতায়াত শুরু করে দেবে। এ সে সময়ের কথা যখন উত্তর অঞ্চলসমূহ ও পারস্য উপসাগরীয় পথে রোমান সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় চলছিল, তার ওপর পারস্যের সাসানীয় সরকার আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। ফলে দক্ষিণ আরব হতে লোহিত সাগরের বেলাভূমির সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া ও মিসরের দিকে যে বাণিজ্য পথ চলে গেছে তার ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। অন্যান্য আরব গোত্রের তুলনায় কুরাইশদের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। তারা আল্লাহর ঘরের সেবক ছিল বলে পথে অবস্থিত সব গোত্র তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশের লোকেরা যে উদারতা ও বদান্যতার সঙ্গে হাজীদের খেদমত করতো, সে জন্য সব লোকই তাদের অনুগৃহীত ছিল। পথের মাঝে তাদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর কোন আক্রমণ হওয়ার কিংবা ডাকাত পড়ার কোন ভয় তাদের ছিল না। উপরন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট হতে যে মোটা পথ কর কিংবা শুল্ক আদায় করা হতো তাদের নিকট হতে সেরূপ কর আদায় করাও সহজ ছিল না। হাশিম এসব সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবসায় চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো এবং নিজের পরিকল্পনায় তার তিন ভাইকে শরীক করলো। সিরিয়ার গাসসানী বাদশার নিকট হতে হাশিম, হাবশার বাদশাহর নিকট হতে আব্দে শাম্স, ইয়েমনী রাজন্যবর্গের নিকট হতে মুত্তালিব এবং ইরাক ও পারস্যের সরকারসমূহের নিকট হতে নওফল নানাবিধ ব্যবসায়ী সুযোগ-সুবিধা লাভ করলো। এর ফলে তাদের ব্যবসায় খুব দ্রুততার সংগে উন্নতি লাভ করে। উত্তরকালে এই চার ভাই 'মুত্তাজিরীন'-'ব্যবসায়ী' নামে পরিচিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আশে-পাশের গোত্র ও রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তাদের যে নিবিড় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তার দরুন তাদেরকে আসহাবুল 'ঈলাফ'-'সম্পর্ক' সম্বন্ধ ও বন্ধুতা স্থাপনকারী লোক বলা হতে লাগলো।

এ ব্যবসায় — বাণিজ্য ব্যপদেশে কুরাইশ বংশের লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরাক, পারস্য, ইয়েমন ও হাবশা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং এর ফলে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা ও মননশীলতার মান খুবই উন্নত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরবের অন্য কোন গোত্র তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা সারা আরবের মধ্যে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিল। মক্কা এভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হলো। এসব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধে একটা বড় কল্যাণময় দিক এ ছিল যে কুরাইশের লোকেরাই ইরাক হতে বর্ণমালা নিয়ে এল। পরে সেই বর্ণমালাই কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরাইশদের মধ্যে যত লেখা-পড়া জানা লোক ছিল, আরবের অন্য কোন গোত্রই সেরূপ ছিল না। এসব কারণে নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন قريش قادة النّاس কুরাইশ বংশের লোক অন্যসব লোকের নেতা (মুসনদে আহমদ, -'আমর ইবনুল আ'স-এর বর্ণনা)। বায়হাকীতে হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ كَانَ هذَا الأمرُ فِى حِمِيرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنهُم وَجَعَلَه فِى قُرَيشٍ -

-আরবের সরদারী ও নেতৃত্ব প্রথমে হিমইয়ার লোকদের নিকট ছিল। পরে আল্লাহ তাদের নিকট হতে তা কেড়ে নেন এবং তা কুরাইশদের দান করেন।

কুরাইশরা এমনিভাবে উন্নতির পর উন্নতির দিকে চলে যাচ্ছিল, এ সময়ই মক্কার ওপর আব্‌রাহা বাহিনীর আক্রমণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন আব্‌রাহা যদি এ পবিত্র শহর জয় করতে ও কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হতো তাহলে আরব দেশে কেবল কুরাইশদের নয়, কা'বার সুনাম-সুখ্যাতিও চিরতরে শেষ হয়ে যেত। জাহেলিয়াতের যুগের আরবরা যে এই ঘর সত্যই আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করতো ও মানতো তা আর অবশিষ্ট থাকতো না। এ ঘরের সেবক হওয়ার দরুন কুরাইশদের যে সম্মান ও মর্যাদা সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। মক্কা পর্যন্ত হাবশীদের অগ্রগতি লাভের পর রোমান সাম্রাজ্য অগ্রসর হয়ে সিরিয়া ও মক্কার মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের পথের উপরও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে নিতো। আর কুরাইশরা কুসাই ইবনে কিলাবের পূর্বে যে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল অতঃপর তারা এ হতেও কঠিনতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো। কিন্তু আল্লাহতাআলা যখন নিজের অসাধারণ কুদরতের মহিমা দেখিয়ে পাখীর দ্বারা পাথরকুচি বর্ষণ করিয়ে আব্‌রাহার ষাট হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মক্কা হতে ইয়েমেন পর্যন্ত সমস্ত পথে এ ধ্বংস-প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা এখানে-ওখানে পড়ে পড়ে মরে থাকলো, তখন কা'বা যে আল্লাহর ঘর এ বিশ্বাস সমগ্র আরববাসীদের মনে পূর্ব হতেও অধিক দৃঢ়মূল হয়ে বসলো। সে সংগে কুরাইশদের প্রতিপত্তি সমগ্র দেশে পূর্বাপেক্ষাও অনেক বেশী বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। আরবদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগলো যে, তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা নির্ভিক চিত্তে আরবের সর্বত্র যাতায়াত করতো। নিজেদের ব্যবসায়-কাফেলা নিয়ে সবদিকেই চলে যেতে পারতো। তাদের পথে বাধা বা কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করার দুঃসাহস কারো হতো না। শুধু তাদের ব্যাপারই নয়, তাদের নিরাপত্তার অধীন অন্য কোন লোককেও কেউ 'টু' শব্দ বলতে সাহস পেত না।

মূল বক্তব্য

নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতকালে আরবের সব লোকেরই এ কথা জানা ছিল। এ কারণে এখানে এর বিস্তারিত উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। এ জন্যই এ সূরাটিতে চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে কুরাইশদেরকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই যখন এ ঘরকে দেব-দেবীর ঘর নয়- একমাত্র আল্লাহর ঘর মানছো আর কেবল আল্লাহ-ই-আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়- তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এরূপ নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করেছেন এবং তোমাদেরকে দারিদ্র ও অনশনের কষাঘাত হতে রক্ষা করে এইরূপ স্বাচ্ছন্দ' ও ঐশ্বর্যের অধিকারী বানিয়েছেন, তখন কেবলমাত্র সেই এক খোদারই বন্দেগী করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য ।

এক তার রুকু মক্কী কুরাইশ সূরা চার তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا

যেহেতু অভ্যস্থ হয়েছে | কুরাইশরা | তাদের অভ্যস্ত হওয়া | সফরে | শীতের | ও | গ্রীষ্মের | সুতরাং তাদের উচিৎ ইবাদত করা

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ

রবের | এই | ঘরের | যিনি | তাদের আহার দিয়েছেন | হতে | ক্ষুধা | এবং | তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন

مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

হতে | ভয়

সূরা কুরাইশ

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে।

২। (অর্থাৎ) শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত১।

৩। কাজেই তাদের কর্তব্য হল এই ঘরের২ রবের ইবাদত করা।

৪। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।৩

১। শীত ও গ্রীষ্মকালীনসফর বা বিদেশযাত্রার অর্থ বাণিজ্যিক যাত্রা গ্রীষ্মকালে কুরাইশগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো এবং শীতকালে তাদের বাণিজ্য যাত্রা হতো দক্ষিণ আরবের দিকে। এই বাণিজ্য পর্যটনসমূহের বদৌলতে তারা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠে ছিল।

২। এই ঘর অর্থ- পবিত্র কা'বা ঘর।

৩। মক্কাতে হারাম শরীফের অবস্থা হেতু তা পবিত্র ও নিষিদ্ধ নগরীরূপে থাকায় এ নগরীর উপর আরবের কোন গোত্রের আক্রমণের আশংকা কুরাইশদের ছিল না এবং কুরাইশরা পবিত্র কা'বা ঘরের সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক থাকার কারণে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা আরবের সর্বত্র বিনা বাধায় অতিক্রম করতো, তাদের অনিষ্ট বা তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে সকলে বিরত থাকতো।

সূরা আল-মা'উন

নামকরণ

সূরার শেষ আয়াতের শেষ শব্দ 'আল মা'উন'কে এর নাম রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইব্‌নে মারদুইয়া হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ) ও ইব্‌নুযযুবাইর (রাঃ)-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে তাঁরা একে মক্কী সূরা বলেছেন। 'আতা' ও জাবির প্রমুখ কুরআনবিদদেরও এই মত। কিন্তু আবু হাইয়ান তাঁর আল বাহরুল মুহিত গ্রন্থে ইব্‌নে 'আব্বাস, কাতাদাহ ও দহ্‌হাকের যে উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন, তাতে একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। আমাদের মতে প্রকৃতপক্ষে এ সূরার অভ্যন্তরেই এমন একটা সাক্ষ্য বর্তমান যা হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কায় নয়, মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরায় নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী নামাযী ও প্রদর্শনীমূলক নামায পাঠকারীদের সম্পর্কে এক তীব্র-কঠোর অভিসম্পাতের বাণী সংযোজিত হয়েছে আর এটাই হলো এ সূরার মাদানী হওয়ার একটি বড় ও অকাট্য প্রমাণ। কেননা, সূরার এ কথাটি মুনাফিকদের সম্পর্কে। আর এ ধরনের মুনাফিক মক্কা শরীফে দেখা যায়নি, কেবলমাত্র মদীনার সমাজেই তারা বর্তমান ছিল, কেননা ইসলামী আদর্শবাদী লোকেরা মদীনায় ক্ষমতাশালী হয়েছিল। ফলে অনেক লোক নিতান্ত আত্মরক্ষামূলক কৌশল স্বরূপ ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল। আর নিজেদের মুসলমানিত্ব জাহির করার জন্য তাদেরকে মসজিদে আসতে, নামাযের জামা'আতে শরীক হতে ও প্রদর্শনীমূলক নামায পড়তে হতো। যতটুকু কাজ করলে তারা মুসলমান গণ্য হতে পারতো এবং কেউ তাদেরকে অমুসলমান মনে করতে পারতো না কেবল সেটুকু কাজই তারা করতো। কিন্তু মক্কায় এই ধরনের অবস্থা আদৌ ছিল না। সেখানে কাউকে লোক দেখানো নামায পড়তে হতো না। সেখানকার সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ঈমানদার লোকদের পক্ষে জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়া খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল। লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যভাবে নামায পড়লে সেখানে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো। মুনাফিক সেখানে একেবারেই পাওয়া যেত না এমনও নয়। তবে লোক দেখানো ঈমান গ্রহণকারী,প্রদর্শনীমূলক নামায পড়ার যে মুনাফিকী, তা সেখানে ছিল না। তবে ছিল, যারা নবী করীম (সঃ) যে সত্য নবী তা জানতো এবং মানতোও বটে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজেদের সরদারী, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য-কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হতো না। ঈমান এনে তারা এমন বিপদে পড়তে রাজী ছিল না, যাতে তখনকার মুসলমানদেরকে তারা নিজেদের চোখে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছিল। মক্কী পর্যায়ের এ ধরনের মুনাফিকদের অবস্থা সূরা 'আনকাবুত' ১০-১১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

পরকালের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের কি রকমের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণ করাই এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে প্রকাশ্যভাবে পরকালে অবিশ্বাসী কাফিরদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর শেষ চারটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লোকেরা বাহ্য মুসলমান হলেও তাদের অন্তরে পরকাল ও পরকালীন শুভ-অশুভ ও সওয়াব-শাস্তি সম্পর্কে তাদের কোনই ধারণা ছিল না। মোটামুটিভাবে উভয় ধরনের লোকদের কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো লোকদের মনে এ কথা দৃঢ়মূল করে বসানো যে, পরকালের প্রতি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান না থাকলে মানুষের মধ্যে সুদৃঢ়, স্থায়ী ও পবিত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কখনো গড়ে উঠতে পারে না।

এক তার রুকু মক্কী মাউন সূরা সাত তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

أَرَءَيْتَ	الَّذِىْ	يُكَذِّبُ	بِالدِّيْنِ ۝١	فَذٰلِكَ	الَّذِىْ	يَدُعُّ	الْيَتِيْمَ ۝٢
তুমি দেখেছ কি	(তাকে) যে	অবিশ্বাস করে	বিচার দিনকে	অতঃপর সে ঐ (লোক)	যে	ধাক্কা দেয়	ইয়াতীমকে

وَ	لَا	يَحُضُّ	عَلٰى	طَعَامِ	الْمِسْكِيْنِ ۝٣	فَوَيْلٌ	لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
এবং	না	উৎসাহিত করে	ব্যাপারে	খাদ্যদানের	মিস্‌কীনকে	অতএব ধ্বংস	(ঐসব) নামাযীদের জন্য

الَّذِيْنَ	هُمْ	عَنْ	صَلَاتِهِمْ	سَاهُوْنَ ۝٥	الَّذِيْنَ	هُمْ	يُرَآءُوْنَ ۝٦
যাদের (বৈশিষ্ট্য হল)	তারা	হতে	তাদের নামায	উদাসীন	যাদের (বৈশিষ্ট্য হল)	তারা	লোকদের দেখানোর (কাজ করে)

وَ	يَمْنَعُوْنَ	الْمَاعُوْنَ ۝٧
এবং	দেওয়া হতে বিরত থাকে	সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসের

সূরা আল-মাউন
[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৭,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে পরকালের শুভ প্রতিফল ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে?

২-৩। এতো সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় আর মিস্‌কীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না ১।

৪-৫। পরন্তু ধ্বংস সেই মুসল্লিদের জন্য যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায় ২।

৬। যারা লোক দেখানোর কাজ করে।

৭। আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস (লোকদিগকে) দেয়া থেকে বিরত থাকে।

১। অর্থাৎ নিজেকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজ পরিবারবর্গকেও দরিদ্রকে অন্ন দান করতে বলে না এবং অপর লোকদেরকেও দরিদ্রদের সাহায্যে প্রেরণাদান করে না।

২। এর অর্থ-নামাযের মধ্যে ভুল করা নয়, বরং এর অর্থ-নামাযের প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন থাকা।

সূরা আল-কাওসার

নামকরণ

انا اعطينك الكوثر -এর الكوثر শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইব্‌নে মারদুইয়া হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; এ সূরাটি মক্কী। কালবী ও মুকাতিল প্রমুখও একে মক্কী বলেছেন। বেশীরভাগ মুফাসসীরদেরও এই মত। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদহ একে মাদানী সূরা বলেছেন। ইমাম সুয়ুতী তাঁর আল-ইত্‌কান গ্রন্থে এ মতকেই সঠিক মত বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর তার কারণ হলো ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌নে আবু শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইব্‌নে মারদুইয়া ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দীস গণ হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসই হলো এর ভিত্তি। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) আমাদের মাঝে বসেছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর ওপর যেন তন্দ্রা আচ্ছন্ন হয়ে এলো। পরে তিনি স্মিত হাসি সহকারে মাথা তুললেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি কারণে হাসছেন? আর অপর কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি নিজেই লোকদেরকে বললেন, এইমাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে'। পরে তিনি বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওসার পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান কাওসার কি? লোকেরা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল বেশী জানেন। বললেন, তা একটা ঝর্ণাধারা যা আমার খোদা আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এ বর্ণনার যুক্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলা হয়েছে এ কারণে যে হযরত আনাস (রাঃ) মক্কায় নয়, মদীনায় ছিলেন। তিনি যখন বললেন যে, এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাযিল হয়েছে, তখন স্বতঃই প্রমাণিত হলো যে, এটা মদীনায় নাযিল হয়েছে।

কিন্তু অপর বর্ণনা হতে এর বিপরীত কথা জানা যায়। এটা হযরত আনাস (রাঃ) হতেই আহমদ, বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌নে জরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জান্নাতের এই নহর (কাওসার) রসূলে করীম (সঃ)কে মিরাজের সফরকালে দেখানো হয়েছে। আর সকলেই জানেন, মিরাজ হিজরাতের পূর্বে মক্কা শরীফে থাকাকালে হয়েছিল। এই হলো প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, মিরাজে নবী করীম (সঃ)কে এই দানের কেবল খবরই দেয়া হয়নি, তার পর্যবেক্ষণও করানো হয়েছিল। এই যদি হয়ে থাকে তাহলে নবী করীম (সঃ) কে এর সুসংবাদ দেয়ার জন্য মদীনা শরীফে সূরা 'কাওসার' নাযিল করার কোন কারণ ছিল না। তৃতীয় তত্ত্ব হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীস হতে যেমন জানা যায়, নবী করীম (সাঃ) নিজেই যদি সাহাবীদের এক মজলিসে সূরা কাওসার নাযিল হওয়ার কথা বলে থাকেন, আর তখনি এ সূরা নাযিল হয়েছে বলে যদি মনে করা হয় তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে জুবাইরের (রাঃ) ন্যায় সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল সাহাবী একে 'মক্কী' সূরা মনে করতে পারেন, আর অধিকাংশ মুফাসসির-ই বা একে 'মক্কী' বলতে পারেন কিভাবে? এ ব্যাপারটি চিন্তা করলে হযরত আনাসের (রাঃ) প্রথমোক্ত বর্ণনায় কিছুটা শূন্যতা বা অস্পষ্টতা আছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। সে শূন্যতা ও অস্পষ্টতা হলো, যে মজলিসে নবী করীম (সঃ) উক্তরূপ কথা বলেছিলেন, তাতে শুরু হতে কি সব কথাবার্তা চলছিল তা বিস্তারিত বলা হয়নি। সম্ভবত তখন নবী করীম (সঃ) কোন বিষয়ে কিছু বলছিলেন। আর সে মুহূর্তে অহী'র সাহায্যে তাঁকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, এ বিষয়টির ওপর সূরা 'কাওসার' হতে আলো পাওয়া যেতে পারে। আর অমনি তিনি এ কথাটি এমনভাবে প্রকাশ করলেন, যাতে মনে হলো যেন তিনি বলছেন, যে আমার প্রতি এ সূরা (এখনি) নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে। আর তাফসীরকারগণ এ কারণেই কোন কোন আয়াত দু'বার নাযিল

নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোন আয়াতের দ্বিতীয়বার নাযিল হওয়ার আসল অর্থ হলো আয়াতটি মূলত পূর্বে একবার নাযিল হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সে আয়াতের প্রতি নবী করীমের (সঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র। এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা কোন আয়াত সম্পর্কে তা মক্কী কি মাদানী তার চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না, আর ঠিক কোন সময় তা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য এ ধরনের বর্ণনা যথেষ্ট দলিলও হতে পারে না।

তবু বলা যেতে পারে, হযরত আনাসের প্রথমোক্ত বর্ণনা কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। নতুবা সূরা কাওসার-এর মূল বক্তব্যই অকাট্যভাবে বলে দেয় যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে তখন যখন নবী করীম (সঃ) অত্যন্ত কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এর পূর্বে সূরা দোহা ও সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্‌তে আপনারা দেখেছেন যে, নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সঃ) অত্যন্ত কঠিন বিপদ ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। গোটা জাতিই তার শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে শত্রুতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। সব দিকেই বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের পাহাড় দুরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে দিকেই তিনি তাকাতেন সেদিকেই প্রবল বিরোধিতা তাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগীসাথী দূরে দূরেও কোন সাফল্যের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন না। এরূপ পরিস্থিতিতে নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর মধ্যে সাহস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'আলা পর পর কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। সূরা 'দোহা'য় এ সময়ই তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

-নিঃসন্দেহে তোমার প্রত্যেকটি পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে ভালো ও মংগলময় হবে এবং শীঘ্রই তোমার খোদা তোমাকে এমন কিছু দিবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। সূরা আল ইন্‌শিরাহতে বলা হয়েছে ঃ 'এবং আমি তোমার উল্লেখ ধ্বনি অত্যন্ত উচ্চ করিয়া দিয়াছি।' অর্থাৎ শত্রুরা তো সারাদেশে তোমার দুর্নাম করে বেড়ায় কিন্তু আমি তাদের ইচ্ছা ও চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তোমার সুনাম-সুখ্যাতি করার ও তোমাকে সঠিক প্রসিদ্ধি-পরিচিতি দানের আয়োজন করে দিয়েছি।

এ সূরায় আরো বলা হইয়াছে ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

-'সত্য কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা আসবে। নিশ্চয়ই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।'

অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কঠিনতা ও বিপদ-আপদ দেখে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ো না। এ দুঃখ ও বিপদের সময় শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং সাফল্য ও সফলতার যুগ অবশ্যই আসবে।

ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে সূরা 'কাওসার'ও নাযিল হয়েছে। এ সূরা নাযিল করে আল্লাহতা'আলা একদিকে যেমন নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সে সংগে অপরদিকে শত্রু পক্ষের চরম ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদও দিয়াছেন। কুরাইশ কাফেররা বলতো, মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র জাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তার এখন নিতান্ত বন্ধু-বান্ধবহীন, অসহায়, নিরুপায় অবস্থা। ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন নবীরূপে প্রেরিত হলেন এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন কুরাইশ লোকেরা বলতে লাগলো। بتر محمد منا (ابن جرير) অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) স্বজাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হয় এবং কিছুকাল পর তা শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়। তাঁরও ঠিক সে অবস্থাই হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক বলেন, মক্কার সরদার আস-ইব্‌নে ওয়াইল সহমী'র সামনে কখনো নবী করীমের (সঃ) উল্লেখ হলে সে বলতোঃ 'ওর কথা আর বলো না। ওতো 'আব্‌তার' (শিকড় কাটা) ব্যক্তি, তাঁর কোন সন্তানই নেই। মরে গেলে পর তাঁর নাম নেয়ারও কেউ থাকবে না। শিমর ইবনে 'আতীয়া বলেন, 'উকবা ইব্‌নে আবু মুআইতও নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে এ ধরনের কথা-বার্তাই বলতো (ইব্‌নে জরীর)। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

মদীনার ইহুদী সরদার কা'আব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় এলে কুরাইশ সরদাররা তাকে বললো ঃ

أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا الصَّبِيِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ يَزْعَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا
وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ السِّدَانَةِ أَهْلُ السِّقَايَةِ -

-'এ ছেলেটাকে দেখোতো। এ নিজ জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ নিজেকে আমাদের অপেক্ষা উত্তম মনে করে। অথচ আমরাই হজ্জ ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থাপক'(বায্যার)। এ প্রসংগে ইক্‌রামার বর্ণনা হলো কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে الصنبور المنبتر من قومه বলে অভিহিত করতো। এর অর্থ হলো ঃ দুর্বল, অসহায়, নিরুপায় ও নিঃসন্তান এবং নিজ জাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (ইবনে জরীর)। ইব্‌নে সাআদ ও ইব্‌নে আসাকির-এর বর্ণনা হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীমের (সঃ) সন্তানদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন কাসিম (রাঃ) তাঁর ছোট ছিলেন হযরত জয়নাব (রাঃ) তাঁর ছোট ছিলেন আবদুল্লাহ। এদের পরে পরপর তিনজন কন্যা-উম্মে কুলসুম (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ) ও রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত কাসিমের ইন্তেকাল হয়। তাঁর পর হযরত 'আবদুল্লাহ ইহকাল ত্যাগ করেন। এ সময় আস-ইবনে অয়েল বললো ঃ তাঁর (নবী করীমের) বংশ শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি 'আব্‌তার' (অর্থাৎ তাহার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে 'আস বলেছিল ঃ

إِنَّ مُحَمَّدًا أَبْتَرُ لَا إِبْنَ لَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ

-'মুহাম্মদ 'আব্‌তার'। তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন পুত্র সন্তান তাঁর কেউ নেই। তিনি যখন মরে যাবেন, তখন তাঁর নাম-চিহ্ন দুনিয়া হতে মুছে যাবে এবং তাঁর কারণে তোমরা যে অসুবিধায় পড়েছ, তা হতে তোমরা মুক্তি পেতে পারবে'।

'আব্‌দ ইবনে হুমাইদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা হতে জানা যায়, নবী করীমের (সঃ) পুত্র 'আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হলে আবু জেহেলও এ ধরনের কথাই বলেছিল। ইব্‌নে আবু হাতিম শিমার ইব্‌নে 'আতীয়া হতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন-নবী করীমের (সঃ) এ মর্মন্তুদ দুঃখে উকবা ইব্‌নে আবু মু'আইত আনন্দের উৎসব করে চরম নীচতার পরিচয় দিয়েছিল। আতা বলেন, নবী করীমের (সঃ) দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তেকাল হলে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব (নবী করীমের ঘরের সংগেই লাগানো ছিল তার ঘর) দৌড়ে মুশরিকদের নিকট গেল এবং তাদেরকে সুসংবাদ(?) দিয়ে বললো ঃ بتر محمد الليلة আজ রাতে মুহাম্মদ (সঃ) পুত্রহীন হয়েছেন' (বা তাঁর শিকড় কেটে গেছে)!

নবী করীমের (সঃ) এই মর্মবিদারক অবস্থার মধ্যে সূরা কাওসার তাঁর প্রতি নাযিল হয়। তিনি যেহেতু কেবল মাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী ও ইবাদত করতেন ও কাফেরদের মুশরেকী আকীদা ও আচরণকে তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করেছিলেন, কেবলমাত্র এ কারণেই সমস্ত কুরাইশ রসূলের (সঃ) শত্রু হয়ে যায়। নবুয়তের পূর্বে সমগ্র জাতির মাঝে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তা কেড়ে নেয়া হয়। তিনি যেন গোটা সমাজে একজন পরিত্যক্ত ও আত্মীয়হীন ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীও সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়লেন। চারদিক হতে তাঁদেরকে বিতাড়িত ও প্রপীড়িত করে তোলা হলো। উপরন্তু নবী করীমের পুত্র একজনের পর আর একজনের মৃত্যুতে তার ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। এরূপ অবস্থায় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে সহানুভূতি ও আন্তরিকতা জেগে ওঠার পরিবর্তে তারা যেন আনন্দের আতিশয্যে ফেটে পড়লো। যে লোক কেবল আপনজনেই নয়, অনাত্মীয় লোকদের প্রতিও যার পর নেই সহানুভূতিমূলক আচরণ করেছেন, এমন এক মহান ব্যক্তির প্রতি এরূপ আচরণ তার মন ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা এক সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকায় সূরা নাযিল করে নবী করীম (সঃ)কে একটা বড় সুসংবাদ দিলেন। এ ছোট সূরার এক বাক্যে তাঁকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, অনুরূপ সুসংবাদ দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিনই দেয়া হয়নি। সে সংগে এ সিদ্ধান্তও শুনানো হলো যে আপনি শিকড় কাটা নন, প্রকৃত নির্বংশ ও শিকড় কাটা তো আপনার শত্রুরা, আপনার বিরুদ্ধবাদীরা।

এক তার রুকু মক্কী কাওসার সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِنَّآ	اَعْطَيْنٰكَ	الْكَوْثَرَ ۝١	فَصَلِّ	لِرَبِّكَ	وَ انْحَرْ ۝٢
নিশ্চয় আমরা	তোমাকে আমরা দিয়েছি	কাওসার	তুমি অতঃপর নামায পড়	তোমার রবের	তুমি কুরবানী এবং দাও

اِنَّ	شَانِئَكَ	هُوَ	الْاَبْتَرُ ۝٣
নিশ্চয়	তোমার শত্রু	সেই	শিকড়-কাটা নির্মূল

সূরা আল-কাওসার

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. (হে নবী!) আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি ১।

২. অতএব তুমি তোমার রবের জন্যই নামায পড় এবং কোরবানী দাও।

৩. তোমার শত্রু-ই প্রকৃত শিকড়-কাটা নির্মূল ২।

১। 'কাওসার'-এর অর্থ ইহকাল ও পরকালের অগণন কল্যাণ, যার মধ্যে হাশরের দিনের (পুনরুত্থান দিবসের) 'হাওয কাওসার' এবং জান্নাতের 'নহর কাওসার'ও অন্তর্ভুক্ত।

২। কাফেররা নবী করীম (সঃ)কে এই অর্থে 'আবতার'-'ছিন্নমূল' বলতো যে, তিনি নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং তাঁর পুত্র-সন্তানও জীবিত নেই। এ জন্য তারা মনে করতো ভবিষ্যতে দুনিয়াতে তাঁর নাম ও নিশানা থাকবে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে- তিনি নাম ও নিশানাহীন হবেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই নামহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূরা আল-কাফিরূন

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত قل يايها الكفرون এর كفرون শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ), হযরত হাসান বসরী ও 'ইকরামা বলেন, এ সূরাটি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এটা মাদানী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ হতে দুটো মত উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম মত অনুযায়ী এটা মক্কী এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটা মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসীরের মতে এটা মক্কী সূরা। এর বিষয়বস্তু হতেও এর মক্কী হওয়ার কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কা শরীফে একটা সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন নবী করীমের (সঃ) দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজ বিরুদ্ধতার প্রচন্ড তুফান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে সময়ও কুরাইশ সরদাররা নবী করীমের (সঃ) ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়নি- তখনো তারা তাঁর সাথে কোন না কোন রকমের সন্ধি-সমঝোতা করে নিতে পারবে বলে আশা পোষণ করছিল। এ আশায় তারা বিভিন্ন সময় নবী করীমের (সঃ) নিকট বিভিন্ন প্রকারের সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতো। তার মধ্যে কোন একটা প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর ও তাদের মধ্যে উদ্ভূত বিবাদ-বিসম্বাদ সহজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটাই ছিল তাদের এ চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। এ পর্যায়ে হাদীসের বহু বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র বর্ণনা হলো কুরাইশরা নবী করীম (সঃ)কে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পত্তি দেব, যাতে আপনি সর্বাপেক্ষা বড় ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবেন, আপনার পছন্দসই যে কোন মেয়ের সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন করে দেব, আমরা আপনার নেতৃত্ব মেনে আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। তবে সে জন্য শর্ত এই যে, আপনি আমাদের মা'বুদের বিরুদ্ধতা ও তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা হতে বিরত থাকবেন। আমাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে আপনি যদি প্রস্তুত না-ই হন, তাহলে এর বিকল্প প্রস্তাবও আমরা আপনার সামনে পেশ করছি। এ প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার পক্ষেও ভালো, ভালো আমাদের পক্ষেও। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তোমাদের সেই বিকল্প প্রস্তাবটি কি?' তারা এর জবাবে বললোঃ'আপনি এক বছরকাল আমাদের মা'বুদ লাত ও উজ্জা'র এবাদত করবেন, আর এক বৎসরকাল আমরা আপনার মা'বুদের উপাসনা করবো।' নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ 'তোমরা অপেক্ষা কর। এ বিষয়ে আমার আল্লাহর নিকট হতে কি নির্দেশ আসে, আমাকে সর্বপ্রথম তাই দেখতে হবে'।*

---

* নবী করীম (সঃ) তাদের এ প্রস্তাবকে কোনরূপে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা, বিবেচনাযোগ্যও মনে করতেন, তা নয়। তিনি আল্লাহর নিকট হতে এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার স্বপক্ষে কোনরূপ অনুমতি আসবে মনে করে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন- মায়াযাল্লাহ এরূপ অর্থও এর নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা রসুলের এ 'অপেক্ষা" কর কথার তাৎপর্য বুঝা যেতে পারে। নিম্নস্থ ব্যক্তি উপরস্থ আফসারের নিকট কোন অবান্তর দাবি পেশ করলে অফিসার সে দাবি সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় জেনেও নিজে স্পষ্ট অস্বীকার করার পরিবর্তে বলে যে, ঠিক আছে, আমি দরখাস্ত উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখান হতে যে উত্তর আসবে তা জানিয়ে দেব। রসূলে করীমের কথা 'অপেক্ষা কর' আল্লাহর নিকট হতে কি নির্দেশ আসে দেখা যাক'- ঠিক এ পর্যায়ের-ই কথা। তাদের আবদার গ্রহণযোগ্য নয় জেনেও নবী করীম (সঃ) নিজেই তা অস্বীকার করলেন না, খোদার ওপর ছেড়ে দিলেন। নিজেই অস্বীকার করলে কুরাইশদের আবদার চলতে থাকতো। আর খোদা-ই এ দাবি গ্রহণ করেন নি শুনলে তারা চিরদিনের জন্যে নিরাশ হয়ে যাবে। নিজেই অস্বীকার করলে তারা মনে করতো, এ বুঝি তাঁর নিজস্ব ব্যাপার আর আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়ায় তারা বুঝলেন যে, এ ব্যাপারে নবী করীমেরও কোন ইখতিয়ার নাই। নবী করীমের এরূপ উত্তরের মাহাত্ম এখানেই।

এ প্রসঙ্গেই অহী নাযিল হলো ঃ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ বল, হে কাফেরগণ।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ (الزمر ٦٤ ايت)

'বল, হে মুর্খরা! তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করতে বলছো"? (ইবনে-জরীর ইবনে হাতিম তাবরানী)

ইব্‌নে আব্বাস বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে বললোঃ হে মুহাম্মদ! এসো যদি আমাদের উপাস্য দেবতা মূর্তিগুলোকে চুম্বন কর, তা হলে আমরা তোমার মা'বুদের ইবাদত করবো। তখন এই 'কাফিরুণ' সূরাটি নাযিল হয় (আবদ্ ইব্‌নে হুমাইদ)।

আবুল বখতরীর মুক্ত দাস সঈদ ইবনে মাইনা বর্ণনা করেছেন, অলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল, আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ রসূলে করীমের (সঃ) নিকট এলো এবং বললো, 'হে মুহাম্মদ! এসো আমরা তোমার মা'বুদের ইবাদত করি, আর তুমি আমাদের মা'বুদের ইবাদত কর। আমরা তোমাকে আমাদের সব কাজে শরীক করে নেব। তোমার উপস্থাপিত জিনিস যদি আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসের তুলনায় উত্তম প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা তোমার জিনিসে শরীক হয়ে যাব এবং তা হতে নিজেদের অংশ গ্রহণ করবো। পক্ষান্তরে আমাদের জিনিস যদি তোমার উপস্থাপিত জিনিস হতে উত্তম হয়, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে তাতে শরীক হবে এবং তা হতে নিজের অংশ গ্রহণ করবে। এর পরই অহী নাযিল হলো قل يايها الكفرون (ইব্‌নে জরীর, ইবনে আবু হাতিম, ইব্‌নে হিশামও তার সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন)।

ওহাব ইব্‌নে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা নবী করীম (সঃ)কে বললোঃ আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে আমরা এক বছর আপনার দ্বীনে শামিল হবো। আর এক বছর আপনি আমাদের দ্বীনে শরীক হবেন। (আবদ্ ইব্‌নে হুমাইদ, ইব্‌নে আবু হাতিম)।

এসব বর্ণনা হতে স্পষ্ট জানতে পারা যায় যে, একবার একই বৈঠকে নয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগে কাফের কুরাইশরা নবী করীমের (সঃ) নিকট এ ধরনের প্রস্তাবাবলী পেশ করেছিল। এ কারণে এ সম্পর্কে একবার চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) দ্বীনের ব্যাপারে 'কিছু দাও কিছু নাও' নীতি অনুযায়ী আমল করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সন্ধি-সমঝোতা করতে প্রস্তুত হতে পারেন- কাফেরদের মনে এ বিষয়ে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলেছিল, তা চিরতরে নিভিয়ে দেয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। এ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে বর্ণিত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে স্পষ্টরূপে মনে হয়, ধর্মীয় উদারতা বা সহ-অবস্থান নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়নি। এতে এ ধরনের কোন ভাবধারা আদৌ বর্তমান নেই। বর্তমানকালের কিছু কিছু লোক যে এটা হতে এরূপ ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত কাফিরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা, অশ্রদ্ধা ও অনমনীয়তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। কুফরী ধর্ম ও দ্বীন ইসলাম যে পুরামাত্রায় পরস্পর বিরোধী, এ দু'টির কোন একটা দিক দিয়েও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না. এ কথাটা তেজস্বী ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার অবশ্যকতা ছিল। বর্তমান সূরাটি সেই আবশ্যকতাই পূরণ করেছে (কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভূল ধারণা)। এ কথাটি যদিও শুরুতে কুরাইশ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে তাদের সমঝোতা প্রস্তাবের জবাবস্বরূপ বলা হয়েছিল, কিন্তু এর মূল বক্তব্য কেবলমাত্র তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন মজীদের এ সূরা কিয়ামত পর্যন্তকার সমস্ত মুসলমানকে এ চিরন্তন শিক্ষা দান করছে যে, কুফর যেখানে যেরূপেই থাকুক না কেন, মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে মুসলমানরা

যে কাফিরদের সঙ্গে কোনরূপ নমনীয়তা বা সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না, তা কোনরূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় বলে ও জানিয়ে দিতে হবে। এ সূরা যাদের আবদারের জবাবে নাযিল হয়েছেল, তারা যখন মরে শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনো এই সূরা পড়া হতো। আর এটা নাযিল হওয়ার সময় যারা কাফির ও মুশরিক ছিল তারাও মুসলমান হওয়ার পর এই সূরা পাঠ করতো। এই লোকদের অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার শত শত বছর পর আজকের মুসলমানরাও এই সূরা পাঠ করছে, কিন্তু এই সূরার মূল বক্তব্য নিয়ে না কোন বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে কোন দিন, না এ ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করা হয়েছে। কেননা কুফর ও কাফিরী আদর্শ ও রীতি-নীতির প্রতি অসন্তোষ ও তার সঙ্গে চূড়ান্ত নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা মুসলমানদের প্রতি ঈমানের শাশ্বত দাবী। কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই এ দাবী উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

নবী করীমের (সঃ) দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি হাদীস হতেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বহুবার নবী করীম (সঃ)কে ফযরের নামাযের পূর্বের ও মাগরিবের নামাযের পরের দু'রাকাআত নামাযে قُل يايها الكفرون + قل هو الله পড়তে দেখেছি। (সামান্য) শাব্দিক পার্থক্যের সঙ্গে এ কথাটির বহু বর্ণনা ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে মাজাহ, ইব্‌নে হাব্বান ও ইব্‌নে মারদুইয়া হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যখন ঘুমাবার জন্য শয্যায় শায়িত হবে, তখন قُل يايها الكفرون পড়বে। স্বয়ং নবী করীমেরও (সঃ) এই নিয়ম ছিল। তিনি ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুলে এই সূরাটি পাঠ করতেন (বাযযার, তাবরানী, ইব্‌নে মারদুইয়া)।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বলেছেন ঃ 'তোমাকে শিরক্ হতে বাঁচাতে ও সুরক্ষিত রাখতে পারে এমন বাণী কি আমি তোমাকে বলবো?.... তা এই যে, শোবার কালে قُل يايها الكفرون পড়বে' (আবু ইয়া'লা, তাবরানী)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রাঃ)কে বললেন ঃ শোবারকালে قُل يايها الكفرون পড়বে, কেননা এটা শিরক-এর সঙ্গে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে (বায়হাকী)।

ফরওয়া ইব্‌নে নওফল ও আবদুর রহমান ইব্‌নে নওফল উভয়ের বর্ণনা হলো, তাদের পিতা নওফল ইব্‌নে মু'আবীয়া আল আশজাঈ রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন ঃ আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি ঘুমাবার সময় পড়বো। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ قُل يايها الكفرون শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে যাও। কেননা এ হলো শিরক হতে নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে আবু শাইবা, হাকেম ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)। হযরত যাইদ ইব্‌নে হারেসার ভাই হযরত জাবলা ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) এ ধরনেরই আবেদন নবী করীমের নিকট করেছিলেন এবং তাঁকেও তিনি এ জবাবই দিয়েছিলেন (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী)।

ছয় তার আয়াত মক্কী কাফেরুন সূরা এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَ لَآ اَنْتُمْ

বল | হে | কাফেররা | না | ইবাদত করি আমি | (তাদের) যাদের | ইবাদত কর | তোমরা | এবং | না | তোমরা

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَ لَآ

ইবাদতকারী | (তার) যার | ইবাদত করি আমি | আর | না | আমি | ইবাদত কারী | যাদের | তোমরা ইবাদত করেছ | আর | না

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ۝٦

তোমরা | ইবাদত কারী | (তার) যার | ইবাদত করি আমি | তোমাদের জন্য | তোমার দ্বীন | এবং | আমার জন্য | আমার দ্বীন

সূরা আল-কাফেরুন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৬ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২। বলে দাওঃ হে কাফেররা ১। আমি সেই রবের ইবাদত করিনা যাদের ইবাদত তোমরা কর। ২

৩। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর, যার ইবাদত আমি করি। ৩

৪। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই যাদের ইবাদত তোমরা করেছ। ৪

৫। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যার ইবাদত আমি করি।

৬। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন। ৫

১। অর্থাৎ হে লোক সকল তোমরা যারা আমার রেসালত (প্রেরিতত্ব) ও আণীত আমার শিক্ষাকে মান্য করতে অস্বীকার করছো।

২। যদিও কাফেররা অন্যান্য উপাস্যের সাথে আল্লাহতা'আলার ইবাদত করতো কিন্তু যেহেতু শেরকের সংগে আল্লাহর ইবাদত আদৌ আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে না- সে জন্য মুশরিকদের সকল উপাস্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩। অর্থাৎ যে গুণরাজি সম্পন্ন খোদার ইবাদত আমি করি তোমরা সে গুণ সম্পন্ন খোদার উপাসক নও।

৪। অর্থাৎ এর পূর্বে তোমরা যে সব উপাস্যের উপাসনা করেছো এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও করেছে আমি সে সব উপাস্যের উপাসক নই।

৫। অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন মিল নেই। আমার পথ পৃথক এবং তোমাদের পথও পৃথক।

সূরা আন-নাসর

নামকরণ

প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ এই نصر শব্দটিকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এটা কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা। এর পর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নবী করীমের প্রতি নাযিল হয়নি* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবরানী ইবনে আবু শাইবা, ইবনে মারদুইয়া)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায়-হজ্জকালে আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে মিনাতে নাযিল হয়েছে। এরপর নবী করীম (সঃ) নিজের উষ্ট্রী (স্ত্রী উটের) পিঠে সওয়ার হয়ে তাঁর প্রখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন (তিরমিযী, বাজ্জার, বায়হাকী, ইবনে আবু শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা, ইবনে মারদুইয়া)। বায়হাকী কিতাবুল হজ্জ-এ হযরত সাররা বিনতে নাবাহানের বর্ণনা সূত্রে নবী করীমের (সঃ) সেই প্রখ্যাত ভাষণটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত সাররা বলেন ঃ

- আমি বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছি হে লোকেরা! তোমরা কি জান আজ কোন দিন? লোকেরা বললো, আল্লাহ এবং তার রসূলই বেশী জানেন। বললেন, আজ আইয়ামে তাশরীকের মধ্যের দিন। পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এ কোন স্থান? লোকেরা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন। বললেন, এটা মশ্‌য়ারে হারাম। পরে তিনি বললেনঃ আমি জানিনা অতঃপর তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো কিনা-সম্ভবত না। সাবধান থেকো তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমন আজকের এই দিনটি এবং এই স্থানটি- যতদিন না তোমরা তোমাদের আল্লাহর সম্মুখে হাযির হবে এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। শুন! এই কথা তোমাদের নিকটবর্তী ব্যক্তি যেন দূরবর্তী ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে দেয়। শুন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি? অতঃপর আমরা যখন মদীনা ফিরে গেলাম তখন বেশী দিন গত না হতেই নবী করীমের ইন্তেকাল হয়ে গেল।

এ দুটো বর্ণনা মিলিয়ে পাঠ করলে স্পষ্ট মনে হয়, সূরা 'নাসর' নাযিল হওয়া ও নবী করীমের (সঃ) ইন্তেকাল হওয়ার মাঝে তিন মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিদায় হজ্জের ও নবী করীমের ইন্তেকালের মাঝে ঠিক এতটা দিনেরই পার্থক্য ছিল।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে। আমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে (মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর, তাবরানী, নাসায়ী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)।

---

* হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সূরার পর কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু নবী করীমের (সঃ) প্রতি সবশেষে কোন আয়াতটি নাযিল হয়েছে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বরা-ইবনে আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে নবী করীমের (সঃ) প্রতি সবশেষে অবতীর্ণ আয়াতটি হলো يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটা কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, যে আয়াত দ্বারা সুদ হারাম করা হয়েছে, তা-ই হলো কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত ওমর (রাঃ) হতে যে ক'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তা হতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব বর্ণনায় তাকে সবশেষে অবতীর্ণ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত ওমরের কথা হলো এই যে, এটা সবশেষে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মধ্যে একটি। আবু উবাইদ তার 'ফাযা-এলুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জরীর তার তফসীরে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূদের আয়াত ও সূরা বাকারার ৩৮-৩৯ নম্বর রুকু আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) অপর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াতটি কুরআনের সব শেষ আয়াত। আল-ফিরয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে আরো বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি নবী করীমের (সঃ) ইন্তেকালের ৮১ দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল। আর ইবনে আবু হাতিম সাঈদ ইবনে জুবাইয়ের (রাঃ) যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীমের (সঃ) মৃত্যু ও এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার মাঝে ৯ দিনের ব্যবধান। ইমাম আহমদের মুসনাদ ও হাকেমের আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত উবাই ইবনে কা'অবের বর্ণনা হলো সূরা তওবার ১২৮, ১২৯ নম্বর আয়াত সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে উঠলেন। তা দেখে তিনি বললেনঃ আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। এ কথা শুনে তিনি (হযরত ফাতিমা) হেসে উঠলেন (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)। বায়হাকী প্রায় এ ধরনের কথাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় বয়স্ক সম্মানিত লোকদের সংগে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আমাকেও ডাকতেন। কারো কারো নিকট এ অসহ্য হলো। তারা বললেন ঃ আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলের মতই, তাহলে একে বিশেষভাবে আমাদের মজলিসে শরীক করা হয় কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জরীর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এ কথাটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেছিলেন)। উত্তরে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ইলমের দিক দিয়ে এর যোগ্যতা-মর্যাদা তো আপনারা জানেন। পরে তিনি একদিন বদর যুদ্ধে শরীক বয়স্ক লোকদেরকে ডাকলেন। আমাকেও তাঁদের সংগে উপস্থিত থাকতে বললেন। আমি বুঝলাম, তাঁদের মজলিসে আমাকে কেন শরীক করা হয়, তা দেখাবার জন্যই আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। কথা-বার্তা চলাকালে হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা اذا جا نصر الله والفتح সম্পর্কে কি বলেন? কেউ বললেন, যখন আল্লাহর মদদ আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে তখন আমরা আল্লাহর হামদ করবো ও তাঁর নিকট ইসতেগফার করবো- এ সূরায় এ নির্দেশই আমাদেরকে দেয়া হয়েছে'। অন্য একজন বললেন এর অর্থ শহর, নগর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অন্যরা চুপচাপ থাকলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইবনে আব্বাস! তোমারও কি এ মত? আমি বললাম না। তিনি বললেন তাহলে তোমার কি মন্তব্য বল? আমি বললাম, এর অর্থ ঃ নবী করীমের মহাপ্রায়ণ। এ সূরায় নবী করীম (সঃ)কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য আসলে ও বিজয় লাভ হলে তা হতে বুঝা যাবে যে, নবী করীমের আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি যেন আল্লাহর হামদ ও ইসতিগফার করেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি যা বললে আমিও এছাড়া অন্য কিছু জানি না। অপর একটা বর্ণনায় একটু বেশী কথা এ আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া বয়ঃবৃদ্ধ লোকদেরকে বললেন এ বালককে এ মজলিসে শরীক করার আসল কারণ তো আপনারা নিজেরাই দেখলেন। তা হলে এ জন্য আমাকে আপনারা কি করে তিরস্কার করতে পারেন (বুখারী, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগভী, বায়হাকী, ইবনুল মুনযির)?

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হতে যেমন জানা গেল, এ সূরায় আল্লাহতায়ালা রসূলে করীম (সঃ)কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আরব দেশে ইসলামের বিজয় যখন সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করবে, তখন স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন আল্লাহর হামদ ও তাঁর তসবীহ করতে নিমগ্ন হন। কেননা তাঁর অনুগ্রহেই তো তিনি এত বড় কাজ সুসম্পন্ন করতে সফল ও সক্ষম হয়েছেন। তিনি যেন আল্লাহর নিকট দো'আ করেন যে, অর্পিত দায়িত্ব পালনে যে ভুল-ত্রুটি কিংবা তাঁর দুর্বলতা দ্বারা হয়ে থাকবে, তা যেন তিনি মা'আফ করে দেন। একজন নবী ও দুনিয়ার একজন সাধারণ জননেতার মাঝে যে কত বড় পার্থক্য থাকে, তা উক্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করলেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। দুনিয়ার কোন জননেতা যদি তার জীবনের চরম লক্ষ্য যে মহা বিপ্লব সৃষ্টি তা বাস্তবায়িত করতে নিজের জীবনেই সফল ও সক্ষম হয়, তাহলে সে জন্য ব্যাপক উৎসবের অনুষ্ঠান করে। আর তার নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের ও স্বীয় যোগ্যতার গৌরব প্রচারের এটাই হয় অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু আল্লাহর নবীর ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তিনি মাত্র তেইশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে একটা গোটা জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, দৃষ্টিকোণ-দৃষ্টিভংগি, অভ্যাস-স্বভাব, নৈতিকতা,

সভ্যতা, সামাজিকতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং সামরিক যোগ্যতা-প্রতিভার আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। মূর্খতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটা জাতিকে জাগ্রত করে তিনি এতখানি যোগ্য বানিয়ে দিলেন যে, তারা দুনিয়াকে জয় করলো এবং বিশ্বজাতিসমূহের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে বসলো। কিন্তু যে নবীর (সঃ) দ্বারা এত বিরাট বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর তাঁকে উৎসব উদযাপনের নয়, আল্লাহর হামদ ও তসবীহ্ করার এবং তাঁর নিকট মাগফিরাতের জন্য দো'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ বিনয়-নম্রতার সঙ্গে এ নির্দেশ পালনে মনোযোগ দেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ দো'আ খুব বেশী করে পড়তেন ঃ

سُبحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمدِكَ استَغفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيكَ

অপর একটা বর্ণনা অনুযায়ী দো'আটি ছিল এইঃ

سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهٖ اَستَغفِرُ اللهَ وَاَتُوبُ اِلَيهِ

'আমি নিবেদন করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ! আপনি এখন এ কি সব কথা পড়তে শুরু করেছেন? তিনি বললেন ঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখনি তা দেখব, তখনি যেন আমি এ কথাগুলো বলি, এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর সে নিদর্শন হলো ঃ اذا جاء نصر الله والفتح (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া)। অনুরূপ অন্য কয়েকটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন নবী করীম (সঃ) রুকু ও সিজদায় খুব বেশী করে এ দো'আ পড়তেন سبحنك اللهم وبحمدك এটাই ছিল কুরআনের (সূরা নাসর-এর) ব্যাখ্যা। নবী করীম (সঃ) নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (বুখারী মুসলিম, আবুদাযুদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে জরীর)।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীমের (সঃ) পবিত্র মুখে তাঁর জীবনের শেষভাগে উঠতে-বসতে ও যেতে-আসতে এ দো'আই সব সময় উচ্চারিত হতো ঃ سُبحَانَ اللهِ و بِحَمدِهٖ আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, হে রসূলুল্লাহ! আপনি প্রায়ই এ কথাগুলো কেন বলতে থাকেন? তিনি বললেন, আমাকে এটা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন (ইবনে জরীর)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হলো তখন নবী করীম (সঃ) খুব বেশী করে এ দো'আ পাঠ করতে লাগলেন ঃ

سُبحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمدِكَ اللّٰهُمَّ اغفِرلِى سُبحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ اللّٰهُمَّ اغفِرلِى اِنَّكَ اَنتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ-

(ইবনে জরীর, মুস্‌নাদে আহমদ, ইব্‌নে আবু হাতিম)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) পরকালের জন্য শ্রম-মেহনত ও সাধনা করার কাজে এত বেশী মগ্ন হয়ে পড়লেন যে, পূর্বে সেরূপ কখনো হয়নি (নাসায়ী, তাবরানী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)।

এক তার রুকু মাদানী নাসর সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ

যখন আসবে সাহায্য আল্লাহর ও বিজয় এবং তুমি দেখবে লোকদেরকে প্রবেশ করছে

فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

মধ্যে দীনের আল্লাহর দলে দলে তখন তুমি তসবীহ্ করবে প্রশংসার সাথে তোমার রবের

وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

এবং তাঁর (নিকট) ক্ষমা চাও তিনি নিশ্চয় হলেন তওবাগ্রহণ কারী

সূরা আন-নাস্‌র
[মদীনায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. যখন [১] আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে

২. আর (হে নবী!) তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

৩. তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ্‌ সহকারে তাঁর তসবীহ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর[২]। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী

১। প্রামাণিক বর্ণনা অনুসারে এ হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ সূরা। নবী করীমের (সঃ) মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্বে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। এরপর কোন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু কোন পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি।

২। হাদীস-সূত্রে জানা যায়- এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) নিজের শেষ দিনগুলোতে খুবই অধিক পরিমাণে আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণকীর্তন, তসবীহ ও হামদ্‌,তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (এসতেগফার) করতেন।

সূরা আল-লাহাব

নামকরণ

প্রথম আয়াতের لَهَب শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে তফসীরকারদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য নেই। কিন্তু মক্কী জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে এটা ঠিক কোন্ অধ্যায়ে, কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবু লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময় নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা ও শত্রুতায় সে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং তার আচরণ ইসলামের পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে এও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম (সঃ) এবং তার গোটা বংশ-পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁদেরকে আবু তালিব গুহায় অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই এমন ব্যক্তি ছিল যে নিজের বংশ-পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল। এ সূরাটি সে সময় নাযিল হয়ে থাকবে। এ আমাদের অনুমান এবং এ অনুমানের একটা বলিষ্ঠ ভিত্তি রয়েছে। আবু লাহাব নবী করীমের (সঃ) আপন চাচা ছিল। নিজেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হবে এবং তার সীমা অতিক্রমকারী আচরণ জনসাধারণের চোখে প্রকট হয়ে উঠবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই এ সূরাটি নাযিল হলে ভাইপোর মুখে চাচার বিরুদ্ধে এরূপ উক্তি শুনতে পেলে লোকেরা নৈতিকতার দিক দিয়ে একে খুবই অবাঞ্ছিত ও অশোভন বলে দোষারোপ করতো।

মূল বিষয়বস্তু

কুরআন মজীদের এই একটি মাত্র স্থানেই ইসলামের এক শত্রুর নাম নিয়ে তার দোষ প্রচার করা হয়েছে। যদিও মক্কা-মদীনা উভয় স্থানেই ইসলাম ও নবী করীমের সঙ্গে শত্রুতায় আবু লাহাব হতেও অধিক অগ্রসর অনেক লোক বর্তমান ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো নাম নিয়ে কুরআনে তার দোষ বলা হয়নি। তাই প্রশ্ন জাগে, কোন্ বিশেষ কারণে কুরআনে এ ব্যক্তির নাম তুলে তার দোষের কথা বলা হলো? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য তদানীন্তন আরব সমাজকে বুঝতে এবং সে সমাজে আবু লাহাবের ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে জানতে হবে।

প্রাচীনকালের সমগ্র আরব ভূমির সর্বত্র ব্যাপক অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা, লুটতরাজ, মারামারি ও চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল। নিজের বংশ-পরিবার ও রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সে সমাজে কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের জান-মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শত শত বছর পর্যন্ত এ অবস্থাই চলছিল। এ কারণে আরব সমাজের নৈতিক মূল্যমানে নিকটাত্মীয় লোকদের সাথে ভালো আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা না করা ও তার হক আদায় না করা সে সমাজে বহু বড় পাপ বলে মনে করা হতো। নবী করীম (সঃ) যখন ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন তখন কুরাইশদের অপরাপর বংশ-পরিবার এবং তাদের সরদাররা তাঁর তীব্র বিরুদ্ধতা করতে শুরু করলেও বনী হাসিম ও বনু মুত্তালিব (হাসিমের ভাই মুত্তালিবের বংশধররা) নবী করীমের কেবল যে বিরুদ্ধতাই করেনি তাই নয় তারা প্রকাশ্যভাবে তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছিল অথচ তাদের অনেকে তখনো তাঁর নবুয়্যতের প্রতি ঈমানও আনেনি। বস্তুত এর মূলে আরবের সেই শতাব্দীকালের 'আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাদের অধিকার বুঝে দেয়ার' ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ প্রভাবই বর্তমান ছিল। কুরাইশের অপরাপর বংশ-পরিবারের লোকেরাও নবী করীমের (সঃ) প্রতি তাঁর রক্তসম্পর্কের লোকদের এ সমর্থন জানানোকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল মনে করছিল। এ কারণে বনুহাসিম ও বনু মুত্তালিবকে একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম পেশকারী ব্যক্তির সমর্থন করে তারা নিজেদের পৈতৃক ধর্মের সীমালংঘন করেছে বলে কখনও

দোষারোপ করেনি। তারা এ কথা খুব ভালোভাবে জানতো ও মানতো যে, এ লোকেরা নিজেদের বংশ-পরিবারের এক ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই তার শত্রুদের হাতে সঁপে দিতে পারে না এবং তাদের স্ববংশজাত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা কুরাইশ ও আরব সকলের দৃষ্টিতেই একটা অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

এ নৈতিক আদর্শকে জাহেলিয়াতের যামানার আরবের লোকেরাও খুবই সম্মানার্হ ও অবশ্য পালনীয় মনে করতো। কিন্তু সে সমাজের একটি মাত্র লোক ইসলামের শত্রুতা করতে গিয়ে এ আদর্শ লংঘন করে বসলো। এ লোকটি ছিল আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবু লাহাব। সে ছিল নবী করীমের (সঃ) আপন চাচা। তাঁর পিতা ও এ লোকটি একই পিতার পুত্র। আরবে তখন চাচাকে পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানর্হ মনে করা হতো। বিশেষত ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃহীন হলে চাচাই তাকে নিজের সন্তানের মত ভালো বাসবে, তদানীন্তন আরব সমাজে চাচার প্রতি এটাই ছিল একমাত্র আশা-ভরসা। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলামের শত্রুতা ও কুফর প্রীতির দরুন আরব সমাজের এ চিরন্তন রীতি লংঘন করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না।

মুহাদ্দীসগণ বিভিন্ন সনদসূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীমকে (সঃ) যখন ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হলো এবং আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভয় দেখান ও সতর্ক করুন বলে কুরআন মজীদে হিদায়াত নাযিল হলো, তখন একদিন সকাল বেলা নবী করীম (সঃ) 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেনঃ 'হায় সকাল বেলার বিপদ'! তদানীন্তন আরবে যদি কেউ অতি প্রত্যুষে কোন শত্রুকে নিজের কবীলার ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য আসতে দেখতে পেতো, তাহলে সে পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ চীৎকার করতে থাকতো। এ ছিল তখনকার সময়ের আরবের সাধারণ নিয়ম। নবী করীমের (সঃ) এ চীৎকার শুনে লোকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলো কে চীৎকার করছে? বলা হলো মুহাম্মদ (সঃ)। তখন কুরাইশের সব বংশের লোকেরা দৌড়ে তার নিকটে এসে উপস্থিত হলো।যে নিজে আসতে পারলো সে নিজেই এলো আর যার নিজের আসা সম্ভব হলো না সে কাউকে পাঠিয়ে দিলো বৃত্তান্ত জানবার জন্য। সব লোক যখন সমবেত হলো তখন নবী করীম (সঃ) এক এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ হে বনু হাসিম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব. হে বনু ফহর, অমুক বংশ, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি এ পাহাড়ের ওধারে এক শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো 'অবশ্যই, তোমার কাছে তো আমরা কখনো মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি'। তখন নবী করীম (সঃ) ঘোষণা করলেন আমি তোমাদেরকে সাবধান করছিঃ সম্মুখে এক কঠিনতম আযাব আসছে। এ কথা শুনার সংগে সংগে এবং অন্য কারো কিছু বলার পূর্বেই নবী করীমের আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলোঃ ؛ تبالك ، الهذا جمعتنا 'তোমার সর্বনাশ হোক! এ কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করছো"?

একটা বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, নবী করীমের প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আবু লাহাব একটা পাথরও তুলে নিয়েছিল (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জরীর প্রভৃতি)।

ইবনে যায়িদ বর্ণনা করেছেন, আবু লাহাব নবী করীম (সঃ)কে একদিন জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি তোমার প্রচারিত দ্বীন কবুল করি তাহলে আমি কি পাব? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ সব ঈমানদার লোক যা পাবে, আপনিও তাই পাবেন। সে বললো, আমার জন্য বাড়তি মর্যাদা কিছু হবে না? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ আপনি আর কি চান? তখন সে বললোঃ

تَبًّا لِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَ هٰؤُلَاءِ سَوَاءً

'এ দ্বীনের সর্বনাশ হোক, যাতে আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে সমান হয়ে যাব, (ইবনে জরীর)

মক্কায় আবু লাহাব নবী করীমের (সঃ) নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। একটা দেয়ালের মধ্যেই উভয়ের বসতবাটি ছিল। তা ছাড়া হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের পিতা), উকবা ইবনে আবু মু'আয়াত, আদী ইবনে হামরা ও

ইবনে আসদাএল হুজালীও নবী করীমের প্রতিবেশী ছিল। এ লোকেরা ঘরেও নবী করীম (সঃ)কে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে দিত না। তিনি কখনও নামায পড়তে থাকলে এরা ওপর হতে ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি তাঁর ওপর ফেলতো ঘরের আংগিনায় রান্না হতে থাকাকালে হাঁড়ির ওপর ময়লা নিক্ষেপ করতো। নবী করীম (সঃ) বাইরে এসে তাদের বলতেন হে বনু আবদে মনাফ! তোমরা তো আমার পাড়া-প্রতিবেশী লোক, কিন্তু তোমাদের এ ব্যাবহারটা কি রকম? আবু লাহাবের স্ত্রী রাতের বেলা নবী করীমের (সঃ) দরজার সামনে কাঁটাযুক্ত আগাছা ফেলে রাখতো। এ ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। তার উদ্দেশ্য ছিল, সকালবেলা ঘরের বাইরে আসার সময় তাঁর বা তাঁর সন্তানাদির পায়ে যেন কাঁটা বিদ্ধ হয় ও কষ্ট পায় (বায়হাকী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জরীর, ইবনে আসাকির, ইবনে হিশাম)।

নবুয়্যত লাভের পূর্বে নবী করীমের (সঃ) দুই মেয়ে আবু লাহাবের উতবা ও উতাইবা নামক দুই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। নবুয়্যতের পর নবী করীম (সঃ) যখন সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে শুরু করলেন, তখন আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে বললো তোমাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা হারাম যদি তোমরা মুহাম্মদের (সঃ) মেয়ে দুটোকে তালাক না দাও। ফলে উভয়ই তালাক দিয়ে দিল। উতাইবা মুর্খতা ও বর্বরতার সীমা লয়ংঘন করে গেল। একদা সে নবী করীমের সামনে এসে বললোঃ 'আমি النجم اذا هوى এবং الذى دنا فتدلى কে অস্বীকার করি।' এ বলে নবী করীমের (সঃ) প্রতি থু থু নিক্ষেপ করলো-যদিও তা তাঁর গায়ে লাগেনি। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! তার উপর তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে একটা কুকর লেলিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার পিতার সাথে সিরীয়া সফরে যাত্রা করে। সফরকালে একটা স্থানে কাফিলা রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বললো, সাবধান থাকবে। এখানে রাতে হিংস্র জন্তু এসে থাকে। আবু লাহাব সংগের কুরাইশ লোকদেরকে বললো তোমরা আমার ছেলেটির জীবন রক্ষার ব্যবস্থা কর। মুহাম্মদের (সঃ) বদদোয়াকে আমি বড় ভয় করি। কাফিলার লোকেরা উতাইবার চার পাশে উট শুইয়ে দিল এবং সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। গভীর রাতে একটি বাঘ উটের বেষ্টনি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলো ও উতাইবাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে গেল (আল ইস্তিআরে ইবনে আবদুলবার, আল-ইসাবা-ইবনে হাজার, দালায়েলুন্নবুয়্যত আবুনয়ম ইসফাহানী, রওযুল উদুফ-সুহায়লী বর্ণনাসমূহে কিছুটা পার্থক্য আছে)। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে তালাক সংক্রান্ত ঘটনা নবুয়্যতের পরে সংঘটিত হয়। আবার কারো মতে তা হয় তাব্বাতইয়াদা- নাযিল হওয়ার পর। থুথু নিক্ষেপকারী উতবা ছিল না উতাইবা এ ব্যাপারেও কিছুটা মতপার্থক্য আছে। তবে উতবা যেহেতু মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করে নবী করীমের (সঃ) হাতে 'বয়'আত গ্রহণ করেছিল বলে নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত। এই কারণে এ লোকটি যে উতবা নয়-উতাইবা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।)

এই লোকটি মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে যে কি ভয়ানক খবীস ছিল, তা একটা ঘটনা হতেই প্রকট হয়ে ওঠে। নবী করীমের (সঃ) পুত্র হযরত কাসিমের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহরও ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকে শরীক হওয়ার পরিবর্তে বিশেষ আনন্দে ও অত্যন্ত খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং কুরাইশ সরদারদের নিকট উপস্থিত হয়ে যেন একটা অতি বড় সুসংবাদ (?) দিতে লাগলো এই বলে- 'নাও, আজ তো মুহাম্মদের নাম-নিশানাও মুছে গেল'।

নবী করীম (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে যেতেন এ লোকটি তাঁর পিছনে-পিছনে চলে যেতো এবং লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো। হযরত রাবী'আ ইবনে আব্বাদদেয়লী বলেন, 'আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি যখন পিতার সাথে যুল্-মাজায-এর বাজারে গেলাম, সেখানে দেখলাম, নবী করীম (সঃ) এরূপ কথা বলছেন 'হে লোকেরা বল, আল্লাহ ভিন্ন কেউ মা'বুদ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ পেতে পারবে। দেখলাম, তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি লোক বলছে 'এ লোকটি মিথ্যাবাদী'। এ লোক পৈতৃক ধর্ম হতে ফিরে গেছে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো,

'এতো তাঁর (নবী করীমের) চাচা আবু লাহাব' (মুস্‌নাদে আহমদ, বায়হাকী)। হযরত রাবী'আর অপর একটা বর্ণনা এই তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (সঃ)কে দেখলাম, তিনি এক এক গোত্রের তাবুতে যাচ্ছেন এবং বলছেন 'হে অমুক বংশের লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত করছি, তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী মেনে নাও এবং আমাকে সমর্থন কর যেন আমি সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি যে কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন'। তাঁর পিছনে পিছনে আর এক ব্যক্তি আসে ও বলতে থাকে, 'হে অমুক বংশের লোকেরা! এই লোকটি তোমাদেরকে 'লাত ও উজ্জা'র দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে এর নিজের নিয়ে আসা বেদ'আত ও গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এই লোকটির কথা আদৌ শুনবে না এবং এর অনুসরণ করবে না'। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তখন তিনি বললেন এ লোকটি নবী করীমের (সঃ) চাচা আবু লাহাব, (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী)। তারিক ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ আল-মুহারেবীর বর্ণনাও এরূপ। তিনি বলেন 'আমি যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বলে যাচ্ছেন 'হে লোকেরা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলো, কল্যাণ লাভ করতে পারবে' আর পিছন হতে এক ব্যক্তি তাঁকে পাথর মারছে। এমনকি প্রস্তরের আঘাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী রক্তে ভিজে যেতে লাগলো। আর সে লোকটি বলে যেতে লাগলো 'এ মিথ্যাবাদী এর কথায় তোমরা কান দেবে না'। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ লোকটি কে? লোকেরা বললো' এ লোকটি এঁর চাচা আবু লাহাব'(তিরমিযী)।

নবুয়্যত লাভের সপ্তম বছরে কুরাইশের সব গোত্র ও পরিবার একত্রিত হয়ে বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে সম্মিলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আর এ দুই বংশের লোকেরা নবী করীমের (সঃ) সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতায় অবিচল থেকে আবু তালিব গুহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের বংশ-পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতা করার পরিবর্তে কাফির কুরাইশের সমর্থন জানালো ও তাদের সংগী হয়ে থাকলো। দীর্ঘ তিনটি বছর পর্যন্ত এ 'বয়কট' চললো। এ সময় বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা অনশন-অর্ধানশনে জর্জরিত হয়ে গেল। এ অবস্থায়ও আবু লাহাব এদের সঙ্গে শত্রুতা করা হতে নিরস্ত হলো না। মক্কায় কোন বিদেশী ব্যবসায়ী কাফিলা আসলেও আবু তালিব গুহার অবরুদ্ধ কোন লোক তাদের নিকট হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে চাইলে তাও অসম্ভব করে দিত। আবু লাহাব ব্যবসায়ী লোকদেরকে ডেকে বলতো 'এদের নিকট দ্রব্যের এতটা মূল্য দাবী কর, যাতে এরা কিছুই ক্রয় করতে না পারে। এর দরুন তোমাদের কোন আর্থিক ক্ষতি হলে আমি তা পূরণ করে দেব।' ফলে ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চ মূল্য দাবী করতো এবং ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তি ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তার অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত পরিবারবর্গের নিকট রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। পরে আবু লাহাব নিজে সে সব দ্রব্য প্রচলিত মূল্যে খরিদ করে নিত (ইব্‌নে সা'আদ, ইব্‌নে হিসাম)।

মোট কথা, আবু লাহাব নবী করীম (সঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধতা ও এ ধরনের অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজে সদাসর্বদা লিপ্ত হয়ে থাকতো। সে জন্য এ সূরায় আবু লাহাবের নামের উল্লেখ করে তার হীন কাজকর্মের সমালোচনা করা হয়েছে। এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মক্কার বাইরের আরবদের মধ্যে যারা হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসতো কিংবা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাজারসমূহে একত্রিত হতো, তাদের সামনে নবী করীমের (সঃ) নিজের চাচাই যখন তার পিছনে পিছনে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করতো, তখন আরবের প্রচলিত রীতি নীতির সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ আচরণ হতো। কেননা কোন চাচা যে অন্য লোকের সামনে নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্রের অকারণ বিরুদ্ধতা করতে পারে, পাথর নিক্ষেপ করে তাকে আহত করতে পারে ও নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে অপদস্থ করতে চেষ্টিত হতে পারে এ যেমন ছিল ধারণাতীত ব্যাপার, তেমনি নিতান্ত অশোভনও। এ কারণে তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হতো ও নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে সংশয়ে পড়ে যেত। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর আবু লাহাব যখন ক্রোধান্বিত হয়ে পাগলের ন্যায় বাজে বকতে শুরু করলো, তখন লোকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, রসূলের করীমের (সঃ) বিরুদ্ধে এ ব্যক্তির কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, এ লোকটি নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধতায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে গেছে।

এছাড়া এতে নাম ধরে যখন নবী করীমের (সঃ) চাচার দোষ বলা হলো, তখন লোকেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো যে, দ্বীনের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) কারো সঙ্গে একবিন্দু খাতির করতে কিংবা কোনরূপ দুর্বলতা দেখাতে প্রস্তুত নন। যখন প্রকাশ্যভাবেই নবী করীমের (সঃ) চাচার হীন চরিত্র ও নীচু মন-মানসিকতার কথা প্রচার করে দেয়া হলো, তখন লোকেরা নিঃসন্দেহে বুঝলো যে, দ্বীন ইসলামে আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্কেরও কোন বিশেষ স্থান নেই। এখানে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। ইসলামে নিতান্ত পরও আপন হয়ে যেতে পারে, যদি সে ঈমান গ্রহণ করে। আর আপনও একান্তই পর হয়ে যায় যদি সে ঈমান না এনে কুফরী অবলম্বন করে। এ ব্যাপারে কে কার পুত্র আর কে কার চাচা বা ভাইপো, এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

এক তার রুকু মক্কী লাহাব সূরা পাঁচ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ

ধ্বংস হলো | দুহাত | আবু লাহাবের | এবং | সেও ধ্বংস হলো | না | কাজে আসলো | তার জন্য | তার মাল | আর

مَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّ امْرَاَتُهٗ

যা | সে উপার্জন করেছিল | শীঘ্রই জ্বলবে | আগুনে | শিখা সমন্বিত | এবং | তার স্ত্রীও

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

(কুটনী বুড়ী বা) বহনকারিণী | কাঠ | তার গলায় | রশি (বাঁধা থাকবে) | পাকানো

সূরা আল-লাহাব

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৫, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. চূর্ণ হলো আবু লাহাবের [১]হাত এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল [২]।
২. তার ধন-সম্পদ, আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজেই আসল না।
৩-৪. সে অবশ্যই লেলিহান শিখা সমন্বিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আর (তার সংগে) তার স্ত্রীও [৩]। কুটনী বুড়ি,
৫. তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

১। এ ব্যক্তি নবী করীমের পিতৃব্য ছিল এবং আবু লাহাব নামে পরিচিত ও খ্যাত ছিল।

২। অর্থাৎ ইসলামের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছিল। এই বাক্যাংশে যদিও পরবর্তীকালে ঘটবে এমন এক ঘটনার ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনা এমনভাবে করা হয়েছে, যেন সে ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে।

৩। এই স্ত্রী লোকের নাম ছিল উম্মেজমীল। এ আবু সুফিয়ানের ভগ্নী ছিল এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতায় এ নিজের স্বামীর থেকে কম ছিল না।

সূরা আল-ইখলাস

নামকরণ

'আল-ইখলাস' হলো এই সূরাটির নাম। কেবল নামই নয়, এতে বলা কথার শিরোনামাও হচ্ছে এটা। কেননা, এ সূরায় খালিস তওহীদ-একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল তওহীদের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরায় সাধারণভাবে এতে উল্লেখিত কোন একটি শব্দকে নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সূরায় 'ইখলাস' শব্দটির উল্লেখ কোথাও হয়নি। এর অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতেই এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত যে ব্যক্তিই এ সূরাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে এর মূল কথার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক্ হতে নিষ্কৃতি পেতে পারবে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে হাদীসের যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তা-ই হলো এ মতবিরোধের উৎস। এখানে সে গুলোর উল্লেখ করা হল ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে বললো, আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন।* তখন এ সূরাটি নাযিল হয় (তাবরানী)।

২. আবুল 'আলীয়া হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের সূত্রে বলেছেন, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ)কে বললো আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করলেন (মুসনাদে আহমদ ইব্‌নে আবু হাতিম, ইব্‌নে জরীর, তিরমিযী বুখারী ইতিহাস গ্রন্থ, ইবনুল মুনযির হাকেম, বায়হাকী)। তিরমিযী এ বিষয়বস্তু সমন্বিত একটা বর্ণনা আবুল 'আলীয়া হতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের সূত্রের উল্লেখ নেই এবং তাকে সব থেকে 'সহী' বলেছেন।

৩. হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, একজন আরব (কোন কোন বর্ণনানুযায়ী লোকেরা) নবী করীম (সঃ)কে বললো আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন, তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন (আবুইয়ালা, ইব্‌নে জরীর, ইবনুল মুনযিল, তাবরানী, আল-আওসাত, বায়হাকী, আবু নঈম-আলহুলিয়া)।

৪. ইকরামা ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, ইহুদীদের একদল লোক রসূলে করীমের (সঃ) নিকট উপস্থিত হলো। কা'আব ইব্‌নে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাবও তাদের মধ্যে ছিল। তারা বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনার সেই রব কি রকম যে আপনাকে পাঠিয়েছে, তা বলুন'। তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন (ইব্‌নে আবু হাতিম ইব্‌নে আদী, বায়হাকী-আল-আসমা আস-সিফাত)।

এসব বর্ণনা ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) তার সূরা ইখলাসের তফসীরে আরো কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তা এই ঃ

৫. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী রসূলে করীমের (সঃ) নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলে ঃ 'হে আবুল কাসিম! আল্লাহতা'আলা ফেরেশতাদেরকে আবরণের নূর হতে, আদমকে মাটির পচাগলা হতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হতে, আকাশমন্ডল ধুঁয়া হতে এবং পৃথিবী পানির ফেনা হতে তৈরী করেছেন। এখন আপনি আপনার আল্লাহ সম্পর্কে বলুন, তাঁকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে? নবী করীম (সঃ) তাদের এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিলেন না। পরে জিব্‌রাইল (আঃ) এলেন এবং তিনি বললেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ) এ লোকদেরকে বলে দিন هو الله احد

* আরবরা যখন কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইতো তখন তারা তার বংশতালিকা জানতে চাইতো, বলতো انسبه لنا এর বংশ তালিকা আমাদেরকে বল। কেননা কারো সঙ্গে পারাচত হওয়ার ও পরিচয় লাভ করার জন্য তার বংশতালিকা ও গোত্র জানাই ছিল তাদের চিরাচরিত রীতি। তাই তারা যখন নবী করীমের (সঃ) নিকট জানতে চাইল যে, আপনার রব কে এবং কি রকম তখন তারা বললো ঃانسب لنا ربك আপনার রবের বংশপরিচয় আমাদিগকে বলুন।

৬. আমের ইবনত্তোফাইল নবী করীম (সঃ)কে বললো হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন? নবী করীম (সঃ) বললেন আল্লাহ তায়ালার দিকে। আমের বললো 'আচ্ছা তা হলে আপনি তার বিবরণ আমাকে বলুন,তিনি স্বর্ণনির্মিত, না রৌপ্য দ্বারা তৈরী অথবা লোহার বানানো? এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

৭. দহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, ইহুদীদের কতিপয় আলিম নবী করীমের (সঃ) নিকট এলো। তারা বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনার আল্লাহর বিবরণ আমাদেরকে বলুন, আমরা আপনার প্রতি হয়তো ঈমান আনতেও পারি! আল্লাহ তাওরাতে নিজের পরিচিতি নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী, কোন্ পদার্থের-স্বর্ণ-নির্মিত, না তামা,পিতল লোহা কিংবা রৌপ্যনির্মিত? আর তিনি কি পান-আহার করেন? তিনি দুনিয়াকে কার নিকট হতে উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছেন? এবং তাঁর পর তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে? এরপর আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল সাতজন পাদ্রীসহ নবী করীমের (সঃ) সমীপে উপস্থিত হলো। তারা নবী করীম (সঃ)কে বললো আমাদেরকে বলুন, আপনার রব কি রকমের? কি জিনিস দ্বারা তৈরী? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার রব কোন জিনিস দ্বারা তৈরী নন। তিনি সব জিনিস হতে স্বতন্ত্র। এ সময় আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

এসব বর্ণনা হতে জানা যায় নবী করীম (সঃ) যে মাবুদের বন্দেগী কবুল করার ও ইবাদত করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন তাঁর প্রকৃত রূপ ও পরিচিতি লোকেরা তাঁর নিকট জানতে চেয়েছিল। আর সর্বক্ষেত্রেই উত্তরে তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এই সূরাটি পেশ করেছেন। সর্বপ্রথম মক্কার কুরাইশ বংশের মুশরিকরা তাঁর কাছে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।তখন এর জবাবস্বরূপ এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। এরপর মদীনা শরীফে কখনো ইহুদীরা কখনো খৃষ্টানরা এবং কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরা নবী করীমের নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছে। আর প্রত্যেকবারই আল্লাহর নিকট হতে উত্তরে এ সূরাটি পেশ করারই নির্দেশ হয়েছে। এ সবকটি বর্ণনার প্রত্যেকটিতেই বলা হয়েছে যে, এ সময় সূরাটি নাযিল হয়।এর দরুন কারো এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, এ বর্ণনাসমূহ বুঝি পরস্পর বিরোধী। না আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপার হলো কোন বিষয়ে একবার কোন আয়াত বা সূরা নাযিল হয়ে থাকলে পরে উক্ত বিষয়ে যখনি নবী করীম (সঃ)কে প্রশ্ন করা হয়েছে তখনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নের জবাব অমুক আয়াত বা সূরায় আছে, কিংবা এর উত্তর অমুক আয়াত বা সূরা, লোকদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিন। হাদীসসমূহের বর্ণনাকারীরা এরূপ ঘটনার বর্ণনা করেন এ ভাষায় যে, অমুক ব্যাপার ঘটেছিল কিংবা অমুক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন এ আয়াত বা এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারকে পুনরায় নাযিল হওয়াও বলা হয় অর্থাৎ বিশেষ কোন আয়াত কিংবা সূরার একাধিকবার নাযিল হওয়া।

অতএব প্রকৃত কথা এই যে, এ সূরাটি মক্কী-সর্বপ্রথম মক্কা শরীফেই এটা নাযিল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর বিষয়বস্তু চিন্তা করলে স্পষ্ট মনে হয় এটা মক্কারও প্রথম যুগে নাযিল হয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মূল সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে অন্য কোন আয়াত নাযিল হয়নি। অথচ লোকেরা নবী করীমের নিকট আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত শুনে এ কথা জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল যে, যে আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর দিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তিনি কি রকমের,কি তাঁর পরিচয়? এ যে একেবারে প্রাথমিক-কালে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম তার আরো একটা প্রমাণ আছে। মক্কায় হযরত বিলালের (রাঃ) মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে প্রচন্ড রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত বালুরাশির উপর চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপর একটা বড় ভারী পাথর রেখে দিত, তখন তিনি কেবল মাত্র أحد - أحد (আহাদ,আহাদ) বলে আল্লাহকে ডাকতে থাকতেন। এই 'আহাদ' শব্দটি এ সূরা হতেই গৃহীত। এটা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে এ সূরাটি রসূলে করীমের মক্কী জীবনে প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য বিশ্লেষণ পর্যায়ে ওপরে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে রসূলে করীম (সঃ) যখন তওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেছিলেন তখন এ সম্পর্কে দুনিয়ার ধর্মসমূহের ধারণা কি ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূর্তি পূজক মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্য দিয়ে তৈরী দেব-দেবীর পূজা করছিল। এগুলোই ছিল তাদের রব। তাদের রবের আকার-আকৃতি ছিল, দেহ ছিল। দেব-দেবীর যথারীতি বংশধারা চলছিল। তাদের কোন দেবী স্বামীহীনা ছিল না, কোন দেবতা ছিল না স্ত্রী হারা। তাদের পানাহারের প্রয়োজন হতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এর ব্যবস্থা করে দিতো। মুশরিকদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ মানবীয় আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আর কোন কোন লোক তার অবতার হয়ে থাকে। তখনকার খৃষ্টানরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে বলে দাবী করতো, কিন্তু তাদের সেই এক আল্লাহর অন্তত একজন পুত্র তো অবশ্যই ছিল। আর রববিয়তের ক্ষেত্রে রুহুল কুদুস পিতা-পুত্রের সহিত অংশীদার ছিল। এমনকি তাদের রবের মাও ছিল, তার শ্বাশুড়ীও ছিল। ইহুদীরাও এক আল্লাহর বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু তাদের সেই এক রবও বস্তুত দেহ ও অন্যান্য মানবীয় গুণের উর্ধে ছিল না।তাদের সেই রব ভ্রমণ করতো, মানবীয় আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতো, নিজেরই কোন বান্দাহর সাথে কুস্তি লড়তো,মুষ্টি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। একটি পুত্রেরও (উজাইর) জন্মদাতা ছিল। এসব ধর্মবিশ্বাসী লোকদের বাইরে ছিল অগ্নিপূজক-মজুসী ও নক্ষত্র পূজক-সাবেয়ী। এরূপ অবস্থায় লোকদেরকে যখন এক ও লাশরীক আল্লাহর বন্দেগী করার আহ্বান দেয়া হলো, তখন তাদের মনে সেই রব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে উপাস্য হিসেবে চলে আসা সব রব ও সব মা'বুদকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র এক ও একক রব ও মা'বুদকে মেনে নেয়ার এই যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সেই রব কে এবং কি ধরনের, কি তাঁর পরিচয় এ প্রশ্ন তখনকার লোকদের মনে তীব্র হয়ে জেগে উঠেছিল। কুরআন মজীদ এ প্রশ্নের জবাবে মাত্র কয়েকটি শব্দসম্পন্ন একটি ছোট সূরা নাযিল করে আল্লাহতা'আলার মহান সত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে। কুরআনের এ জবাবে রব সম্পর্কে সব রকমের মুশরেকী ধারণা-কল্পনার মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। শিরকী আকীদার সূচীভেদ্য অন্ধকারের চির অবসান ঘটিয়েছে। ফলে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে সৃষ্টিকূলের মধ্যে কারো কোন গুণের বিন্দুমাত্র মিল হওয়ার কোনই অবকাশ থাকলো না। বস্তুত এ কুরআন মজীদের এক অতি বড় মু'যিযা তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সূরাটির ফজিলত ও গুরুত্ব

আর এ কারণেই নবী করীমের (সঃ) নিকট এ সূরাটির খুব বেশী গুরুত্ব, মাহাত্ম ও বিরাট মর্যাদা ছিল। তিনি মুসলমানদেরকে নানাভাবে এর গুরুত্ব অনুভব করাতে চেষ্টা করতেন। মুসলমানরা এ সূরাটি খুব বেশী করে পাঠ করুক এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী বেশী প্রচার করুক এটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। কেননা, এ সূরাটিতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-তওহীদ মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতবী বলিষ্ঠ ভাষা ও ভংগিতে বলে দেয়া হয়েছে। এ বাক্য কটি শুনামাত্রই তা মানসপটে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় এবং অতি সহজেই ঠোঁটস্থ হয়ে থাকে। হাদীসসমূহে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বিভিন্নভাবে ও পন্থায় লোকদেরকে বলেছেন, এ সূরাটি এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, তাবরানী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে বহুসংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসসমূহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ), আবু দরদা (রাঃ), মুআয-ইবনে জাবাল (রাঃ),জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কাআব, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, ইবনে ওমর, মসউদ, কাতাদাহ, ইবনে নুমান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তফসীরকারগণ নবী করীমের (সঃ) এ কথাটির অনেক ধরনের ব্যাখ্যা বলেছেন। তবে

সহজ ও সুস্পষ্ট কথা এই যে, কুরআন মজীদ যে দ্বীন ইসলাম পেশ করে,তিনটি প্রধান আকীদাই তার ভিত্তি; প্রথম-তওহীদ, দ্বিতীয়-রিসালাত এবং তৃতীয়-পরকাল। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল ও অকাট্য তাওহীদের আকীদা পেশ করে, এ কারণেই নবী করীম (সঃ) এই সূরাটিকে এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা বুখারী-মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি হলো এই-নবী করীম (সঃ) একজন লোককে একটি বিশেষ অভিযানে নেতা বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে পাঠালেন। এই গোটা অভিযানে তার স্থায়ী নিয়ম ছিল, সে প্রত্যেক নামাযে قل هو الله পড়ে কিরাত শেষ করবে। ফিরে আসার পর তার সংগীরা নবী করীমের (সঃ) নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করলো। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর, সে এরূপ কেন করছিল? তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, যেহেতু এ সূরায় 'রহমান' (আল্লাহ)-এর পরিচয় ও গুণ বলা হয়েছে, এ কারণে তা পাঠ করতে আমার বড় ভালো লাগে। নবী করীম (সঃ) এই কথা শুনে বললেন, اخبروه ان الله يحبه ঐ ব্যক্তিকে বল, আল্লাহতা'আলা তাকে পছন্দ করেন-ভালোবাসেন।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে এ ধরনেরই অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কুবা মসজিদে নামায পড়াতেন। তার নিয়ম ছিল, প্রত্যেক রাক'আতে প্রথম قل هو الله পড়তেন। পরে অপর কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন। লোকেরা এতে আপত্তি জানিয়ে বললোঃ তুমি একি করছো, قل هو الله পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আরো কোন সূরা তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করছো, এ ঠিক নয়। হয় কেবল এ সূরাটি পড় অথবা এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়। সেই লোক বললেন, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে আমি এভাবে সূরা এখলাস নামাযে পড়াবো, না হয় ইমামতী ছেড়ে দেব। কিন্তু লোকেরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি নবী করীমের (সঃ) কাছে পেশ করা হলো। তিনি সেই লোককে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সংগীরা যা চায়, তা মেনে নিতে তোমার বাধা কোথায়? প্রত্যেক রাক'আয়াতে এ সূরাটি পাঠ করতে তোমাকে কি জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে? সেই লোকটি বললেন এ সূরাটিকে আমি যারপরনাই ভালোবাসি। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন حبك إياها ادخلك الجنة এ সূরার প্রতি তোমার এহেন ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছে।

এক তার রুকু মক্কী ইখলাস সূরা চার তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَ

বল তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ মুখাপেক্ষহীন তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নাই এবং

لَمْ يُوْلَدْ ۞ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

তাঁকে জন্ম দেয়া হয় নাই এবং নাই তার সমতুল্য কেউই

সূরা আল-ইখলাস
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াত ঃ ৪,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. বল [১] তিনি আল্লাহ[২] একক[৩]।

২. আল্লাহ সবকিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষীহীন-সবই তার মুখাপেক্ষী,

৩. না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান,

৪. এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।

১। কাফের ও মুশরিকরা রসূলুল্লাহকে (সঃ) প্রশ্ন করতো-আপনার রব (প্রতিপালক প্রভু)-সমস্ত উপাস্যকে বর্জন করে একমাত্র যার ইবাদত করতে যাঁকে উপাস্য বলে করতে চান, তিনি কি ও কিরূপ? তাঁর বংশ পরিচয় কি? কোন বস্তু দ্বারা তিনি গঠিত? কার থেকে তিনি এই সৃষ্টি জগতের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন? কে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবেন, এই সব প্রশ্নে জবাবে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

২। অর্থাৎ যে সত্তাকে তোমরা নিজেরা আল্লাহ বলে জানো, এবং যাঁকে নিজেদের ও সারা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে মান্য কর তিনিই আমার রব। আল্লাহতা'আলা সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের যে ধারণা-বিশ্বাস ছিল পবিত্র কুরআনে স্থানে স্থানে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ ইউনুস-আয়াত ২২-৩১ বনী ইসরাইল আয়াত ৬৭, মু'মেনুন আয়াত ৮৪ থেকে ৮৯, আনকাবুত আয়াত ৬১ থেকে ৬৩, যুখরুখ আয়াত ৮৭।

৩। 'ওয়াহেদ'-এর স্থলে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও উভয় শব্দের অর্থ 'এক' কিন্তু আরবী ভাষায় 'ওয়াহেদ' শব্দটি এরূপ সমস্ত জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যার মধ্যে বহুত্ব বর্তমান থাকে। যথা একটি মানুষ, একটি জাতি, একটা দেশ, এক পৃথিবী,-এসব বস্তুর প্রতি 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, অথচ এ সবের মধ্যে অসংখ্য বহুত্ব বর্তমান আছে। কিন্তু 'আহাদ' শব্দটি মাত্র সেই জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয় যা বিশুদ্ধ 'এক' সব দিক দিয়ে যা 'এক' যার মধ্যে কোন প্রকারের বহুত্ব বর্তমান নেই। এই কারণে আরবী ভাষায় এই শব্দটি বিশেষভাবে মাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

সূরা আল-ফালাক, সূরা আন-নাস

নামকরণ

সূরা দু'টো যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন এবং মূল লিপিতে (মুসহাফে) আলাদা আলাদা নামেই সূরা দু'টো লিখিত আছে। কিন্তু এ দু'টো সূরার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সূরা দু'টোর বিষয়বস্তু পরস্পরের এতই নিবিড় সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, সূরা দু'টোর একটি যুক্ত নাম রাখা হয়েছে। সে নাম হলো

معوذتين 'মু' আব্বেযাতায়ন'-আল্লাহর পানাহ চাইবার দু'টো সূরা। ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়্যাত' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'এ দু'টো সূরা নাযিলও হয়েছে একই সংগে। এ কারণে এ দুটোর উপরোক্তরূপ যুক্ত নামকরণ করা হয়েছে। এজন্যে উভয় সূরার ভূমিকা একত্রে লেখা হয়েছে। কেননা এ দু'টো সূরা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তবে সূরা দুটোর তফসীর আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, 'আতা ও জাবির ইবনে যায়দ বলেন, এ সূরা দু'টো মক্কী-মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপ একটা বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তার অপর একটা বর্ণনায় এ সূরা দু'টোকে 'মাদানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও কাতাদাহরও মত এই। হাদীসের কয়েকটি বর্ণনার কারণেই এ মত বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত 'উকবা ইবনে আমের (রাঃ) কর্তৃক'বর্ণিত। মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (সঃ) একদিন আমাকে বললেন ঃ

الم تَرَ ايَاتٍ أُنزِلَت اللَّيلَةَ لم يُرَ مِثلُهُنَّ اعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

-'আজকে রাতে আমার প্রতি কি ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে তা কি তুমি জানো?... এ তুলনাহীন আয়াত। আর তা হলো 'আউযু বি-রব্বিল ফালাক ও 'আ'উযু বি-রব্বিন নাস'। এ সূরা দুটোর মাদানী হওয়ার স্বপক্ষে এ হাদীসটি একটি বিশেষ দলীল। কেননা, হযরত 'উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) হিজরতের পর মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু দা'উদ ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থদ্বয় স্বয়ং তাঁর জবানীতে এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে সা'আদ, বাগাভী, ইমাম নসাফী, ইমাম বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী, 'আবদ্-ইবনে হুমাইদ প্রমুখ বর্ণিত অপর একটি বর্ণনাও সূরা দুটোকে মাদানী প্রমাণের স্বপক্ষে। সে বর্ণনার বক্তব্য হ'লঃ মদীনায় ইহুদীরা যখন নবী করীমের উপর যাদু করেছিল এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা দুটো নাযিল হয়েছিল। ইবনে সা'আদ-ও আকেদীর সূত্রে বলেছেন, এ ৭ম হিজরী সনের ঘটনা। এ কারণে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-ও এই সূরা দুটোকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু এরূপ যুক্তি যথার্থ নয়। কেননা সূরা ইখলাসের শুরু আলোচনায় যেমন আমরা বলেছি -কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ অমুক ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তখন তা অনিবার্যভাবে সে ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এমন অর্থ করা জরুরী নয়। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, একটি সূরা বা আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছে, পরে কোন একটা বিশেষ ঘটনা সংঘটিত বা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আল্লাহতা'আলা পুনরায় কোন কোন ক্ষেত্রে বারবার- তার দিকে নবী করীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাহ্যত তখন এটাই মনে হয় যে, এ বুঝি এখনি নতুন করে নাযিল হলো, অথচ আসল ব্যাপার তা হয় না। আমাদের মতে আলোচ্য সূরা দুটোর অবস্থাও ঠিক এরূপ। সূরা দুটোর মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয় হতেও এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্পষ্ট মনে হয়

সূরা দুটো প্রথমঃ মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল। নাযিল হয়েছিল তখন, যখন সেখানে নবী করীমের তীব্র বিরোধিতা ও বিরুদ্ধতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরে মদীনা শরীফে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা যখন নবী করীমের বিরুদ্ধতায় প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন আল্লাহতা'আলা পুনরায় নবী করীম (সঃ) কে এ সূরা দুটো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত হাদীসটি হতেও এ কথাই জানা যায়। আরো পরে নবী করীমের ওপর যখন যাদু করা হলো এবং তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আঃ) এসে এ সূরা দুটো পাঠ করার আবার হুকুম দিলেন। এ কারণে যেসব তফসীরকার এই সূরা দুটোকে মক্কী বলেছেন, তাদের কথাই আমাদের দৃষ্টিতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। এ সূরা দুটোকে কেবল যাদু সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়াও সমীচীন নয়। কেননা এই প্রসংগের সম্পর্ক বড় জোর সূরা ফালাক এর ومن شرالنفثت في العقد অংশের সঙ্গে-ই বলা যেতে পারে। এ সূরার অবশিষ্ট অংশসমূহ এবং সূরা 'নাস' সম্পূর্ণ এ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি কোনই সম্পর্ক রাখে না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা শরীফে এ সূরা দুটো যখন সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিলো, তখন সেখানে অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থা বিরাজিত ছিল। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু হতেই স্পষ্ট মনে হলো, যে নবী করীম (সঃ) ভিমরুলের চাকে হাত দিয়ে বসেছেন। তার দ্বীনি দাওয়াতের কাজ যতই অগ্রসর হতে লাগলো, যতই তা বিস্তার লাভ করতে লাগলো, তার সঙ্গে মক্কার কাফের কুরাইশের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা ততই তীব্র ও কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো, প্রথম দিক দিয়ে তারা মনে করছিল যে, কোনরূপ আদান প্রদান করে কিংবা বলে কয়ে ও বুঝিয়ে শুনিয়ে নবী করীম (সঃ)কে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কাজ হতে বিরত রাখতে ও তার 'আঘাত' হতে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে পারবে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ে শত্রুতা খুব প্রচন্ড রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু উত্তরকালে নবী করীম (সঃ) যখন তাদেরকে কোনরূপ আপোস রফা করার বা কাজ হতে বিরত থাকার সব সম্ভাবনা খতম করে দিলেন, তখন তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ) তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ সন্ধি-সমঝোতা করতে প্রস্তুত হবে না বলে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলো। এ সময় সূরা 'কাফেরুণ' নাযিল হয়ে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাটা আরো অকাট্যভাবে ঘোষণা করে দিল। তাতে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো যে, 'তোমরা যার বন্দেগী কর, আমি তাঁর বন্দেগী করতে প্রস্তুত নই এবং যার বন্দেগী আমি করি তোমরা তার বন্দেগী করতে ইচ্ছুক নও'। বিশেষভাবে যেসব পরিবারের পুরুষ, নারী বা ছেলে মেয়েরা ইসলাম কবুল করেছিল, সে সব পরিবারের কর্তাদের মনে তো নবী করীমের বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নিকুন্ড দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো। ঘরে ঘরে তাকে গাল-মন্দ দেয়া হতো, তার তীব্র সমালোচনা করা হতো। তাঁকে রাত্রিবেলা গোপনে অতর্কিতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শলাপরামর্শ হতে লাগলো, যেন বনু হাসেম হত্যাকারীকে চিনতে না পারে ও এর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন পথ উন্মুক্ত না থাকে। এ সময় তাঁর উপর যাদু করতেও চেষ্টা হয়েছিল। যেন তিনি হয় মরে যান কিংবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, অথবা পাগল হয়ে যান। মানুষ ও জ্বিন শয়তান তখন বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবী করীমের (সঃ) এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টা হতে লাগলো। যেসব কারণে সাধারণ লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে, তাকে ত্যাগ করে দূরে চলে যেতে পারে, সে সব কারণ সৃষ্টি করতেও কসুর করা হলো না। অনেক লোকের কলিজা তাঁর প্রতি হিংসায় জ্বলতে লাগলো। কেননা, তারা নিজের ছাড়া, নিজের গোত্রের লোক ছাড়া অন্য কারো ঘরে আলো জ্বলতে দেখবার জন্যও প্রস্তুত ছিল না। আবু জেহেল ছিল এ লোকদের মধ্যে সকলের তুলনায় বেশী অগ্রসর। সে নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতায় সীমালংঘন করে গিয়েছিল। এর কারণ সে নিজেই এক সময় ব্যক্ত করেছিলো। বলেছিল 'বনু আবদে মনাফ (নবী করীমের বংশ) ও আমাদের মাঝে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা

লোকদেরকে খাওয়ালে আমরাও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতাম। তারা লোকদেরকে সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলে আমরাও তাই করতাম। তারা দান করলে আমরাও দান করতাম। এমনকি, আমরা ও তারা যখন মান-মর্যাদায় সমান সমান হয়ে গেলাম, তখন তারা (আবদে মনাফ বংশের লোকেরা) বলতে শুরু করলো যে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, তার নিকট আসমান হতে অহী নাযিল হয়। তখন আমরা তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুলাতে পারলাম না। এ ক্ষেত্রে আমরা কি করে তাদের সমকক্ষতার দাবী করতে পারি। খোদার শপথ, আমরা কক্ষণই এবং কিছুতেই তাঁকে মানবো না। তাঁর সত্যতা স্বীকার করবো না। (ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ)।

এহেন সংকটপূর্ণ অবস্থায় আল্লাহর নিকট হতে নবী করীম (সঃ)কে নির্দেশ দেয়া হলো 'এই লোকদিগকে বল, আমি পানাহ চাই সকাল বেলার রবের নিকট সমস্ত সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে, রাত্রির অন্ধকার ও যাদুকর যাদুকারিনীর দুষ্কৃতি হইতে ও হিংসুকদের অনিষ্ট হইতে' আরো বল 'আমি আশ্রয় চাহি সমস্ত মানুষের খোদার নিকট-সমস্ত মানুষের বাদশাহ ও সমস্ত মানুষের মা'বুদের নিকট বার বার ফিরিয়া আসা ও লোকদের কুপরামর্শ দাতার সব রকমের কুপরামর্শের অনিষ্টতা হইতে, তাহারা জ্বিন শয়তান হউক, কিংবা মানুষ শয়তান হউক'।

বস্তুতঃ এ কথা এবং হযরত মূসা (আঃ) এর বলা উক্তির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ফিরাউন যখন তার জনাকীর্ণ দরবারে হযরত মূসা (আঃ)কে হত্যা করার ইচ্ছা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

-'আমি আমার ও তোমাদের খোদার আশ্রয় লইয়াছি হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি বেঈমান সব অহংকারী-দাম্ভিক হইতে'। (আল মু'মিন-২৭)। وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ

-'তোমরা আমার উপর আক্রমণ করিবে- ইহা হইতে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় লইয়াছি'। (আদ-দোখান-২০)

যে কঠিন মুহূর্তে এ কথাগুলো বলা হয়েছিল, উভয় মহান নবীর (সঃ) জীবনে তা সমান ও সাদৃশ্যপূর্ণভাবে অত্যন্ত সংকটময় ছিল। উভয়ই এ সময় ছিলেন সর্বপ্রকার সহায় সম্বল হতে রিক্ত ও বঞ্চিত। আর প্রতিপক্ষে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বিপুল উপায়-উপকরণ সম্বলিত ও প্রভাব প্রতিপত্তির নিরংকুশ অধিকারী। উভয় অবস্থায় উভয় নবীই মহাশক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে নিজ নিজ দ্বীনী দাওয়াতের ওপর অবিচল ও দৃঢ়সংকল্প হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অথচ এরূপ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত কোন বস্তুগত শক্তি তাদের কারো নিকট ছিল না। তা সত্ত্বেও উভয় নবীই নিজ নিজ শত্রুর ভ্রুকুটি, কুটিল কটাক্ষ, বজ্রকঠোর হুমকি, মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও কুটিল শত্রুতামূলক কলাকৌশলকে কেবল এ কথা বলে নিতান্ত অবজ্ঞা স্বরূপ উপেক্ষা করেছিলেন 'তোমাদের মুকাবিলায় আমরা বিশ্ব স্রষ্টা মহানআল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।' বস্তুতঃ এরূপ উচ্চ মানসিকতা, উন্নত মনোবল ও নীতিদৃঢ়তা দেখানো কেবল মাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার মনে এ গভীর প্রত্যয় বর্তমান যে, আল্লাহই সর্বোচ্চ শক্তি ও ক্ষমতার মালিক, তাঁর প্রতিকূলে দুনিয়ার সর্বশক্তিই হীন ও নগণ্য। সে আল্লাহর আশ্রয় যে লোক লাভ করতে পেরেছে দুনিয়ার কেউ তাঁর এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারে না। এ ধরনের দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তিই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারে সত্য দ্বীন প্রচারের কাজ হতে আমি কিছুতেই বিরত হবো না। আমার আদর্শ হতে আমি কস্মিনকালেও বিচ্যুত হবো না, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। আমি তা বিন্দুমাত্র ভয় করি না। কেননা আমি তো তোমার, আমার ও সারা বিশ্বলোকের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

নবী করীম (সঃ)-এর ওপর জাদুর ক্রিয়া

সূরা দুটোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তা হলো; বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) উপর জাদু করা হয়েছিল। এর ক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জাদুর এ ক্রিয়া দূর করার জন্য জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে নবী করীম (সঃ)কে এ সূরা দুটো পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। এ হলো হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত কথা। এর ওপর প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদী লোকেরা ভয়ানক আপত্তি তুলেছে। তাদের বক্তব্য হলো, এ সব বর্ণনাকে সত্য মেনে নিলে গোটা শরীয়তই সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা নবীর ওপর যদি জাদুর ক্রিয়া হতে পারে, আর এ সব বর্ণনার ভিত্তিতে যদি তা সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে বিরুদ্ধবাদীরা নবীর (সঃ) ওপর জাদু করে তাঁর দ্বারা কত কি বলিয়ে ও করিয়ে নিয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় কত অংশ আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং কত অংশ জাদুর প্রতিক্রিয়া প্রসৃত তা নির্ধারণ করা কঠিন। তাদের কথা এ পর্যন্তই শেষ নয়। তারা এও বলেছে যে, জাদু করার এ কথা যদি সত্যি মেনে নেয়া হয়, তাহলে জাদুর দ্বারা নবীকে (সঃ) নবুয়্যতের দাবী উত্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং তাঁর নিকট ফেরেশতা আসার ভ্রান্তিতে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে না। তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলেছে, এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কুরআনে তো কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এই বলে যে, তারা নবীকে (সঃ) একজন 'জাদু প্রভাবিত ব্যক্তি' مسحور বলেন ঃ

يَقُولُ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا (بنى اسرائيل-٤٧)

আর এ হাদীসসমূহ কাফেরদের এ অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করছে। বলছে, সত্যই নবীর ওপর জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। এ বিষয়টার মীমাংসা করার জন্য সর্বপ্রথম একটা কথা বিচার্য। রসূলে করীমের (সঃ) ওপর যে জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল, তা কি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত? যদি ক্রিয়া হয়েথাকে, তাহলে তা কি রকম ছিল এবং কত দূর ছিল? তার পর বিচার করতে হবে যে, ইতিহাসের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত, তার ওপর যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে তা কি যুক্তিসঙ্গত?

প্রাথমিককালের মুসলিম মনীষীগণ নিজেদের কল্পনা ও ধারণার ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিকৃত করতে কিংবা সত্যকে গোপন করতে চেষ্টা করেননি, বস্তুত এ তাঁদের সততা ও ন্যায়পরতার অকাট্য প্রমাণ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক বিচার-বিবেচনায় তাঁরা যা কিছু সত্য পেয়েছেন, তাকে তাঁরা যথাযথভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীকালের লোকদের পর্যন্ত তা কিছুমাত্র বিকৃত ও রদ্ বদল ব্যতিরেকেই পৌছাবার স্থায়ী ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁদের সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা স্বার্থবাদী লোকেরা কোনরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এ আশংকা বা সম্ভবনাকে তারা বিন্দুমাত্র আমল দেননি এবং এ ভয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণিত সত্যকে লুকাতে বা কিছুমাত্র বিকৃত করতেও সচেষ্ট হননি। তাই কোন কথা যদি প্রকৃত নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ই, তাহলে তাকে সত্য মেনে নিলে মারাত্মক খারাপী দেখা দেবে এরূপ আশংকা করে ইতিহাসকেই অস্বীকার করে বসা কোন ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানবাদী ব্যক্তির নীতি হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইতিহাস হতে ঠিক যতটুকু সত্য প্রমাণিত হয়, কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে আরো অধিক বিস্তীর্ণ করে দেয়া এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কথা নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে জুড়ে নেয়াও কোন ক্রমেই সুবিচারের নীতি হতে পারে না। এ ধরনের সীমালংঘনকারী দুর্নীতির প্রশ্রয় না দিয়ে ইতিহাসকে ঠিক ইতিহাস হিসেবে মেনে নেয়া এবং তা হতে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু প্রমাণিত হয়, আর কি প্রমাণিত হয় না, তা নির্ধারণ করাই একজন ন্যায়বাদী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, নবী করীমের (সঃ) ওপর জাদুর ক্রিয়া হওয়ার

ঘটনাটি অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও যাচাই-পরখের সাহায্যে তাকে যদি মিথ্যা প্রমাণ করা হয়, তাহলে বলতে হবে, দুনিয়ার কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই সত্য প্রমাণিত হতে পারে না। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত যায়দ এবনে আরকাম (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবরানী, ইবনে সা'আদ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আবু শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দীস এতে বিভিন্ন ও বিপুল সনদ সূত্রে এতদসংক্রান্ত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, তার মূল কথাটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যদিও তার এক একটি বর্ণনা 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের। বর্ণনাসমূহে এর যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বর্ণনার সমষ্টি রচনা করে একটা সুসংবদ্ধ ঘটনারূপে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী করীম (সঃ) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ৭ম হিজরী সনের মুহররম মাসে খাইবার হতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হলো ও লবীদ ইব্নে আ'সম নামক একজন প্রখ্যাত জাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। আনসার বংশের বনু যুরাইক্ গোত্রের সঙ্গে এ লোকটির বিশেষ সম্পর্ক ছিল।* তারা তাকে বললোঃ 'মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা তুমি ভালো করেই জান। আমরা তাঁর ওপর জাদু করার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাফল্য লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ কারণে এখন আমরা তোমার নিকট আসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা জানি, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জাদুকর। আমরা তোমাকে তিনটি 'আশরাফী' (তদানীন্তন বহুমূল্যবান স্বর্ণমুদ্রা) দিচ্ছি। তুমি এটা গ্রহণ কর ও মুহাম্মদের উপর খুব শক্ত ও তীব্র ক্রিয়াসম্পন্ন জাদুর আঘাত হান। এ সময় নবী করীমের (সঃ) নিকট একটা ইহুদী ছেলে তাঁর খাদেম ছিল। সে ছেলেটির সঙ্গে যোগ-সাজশ করে সে লোকেরা নবী করীমের (সঃ) চিরুনীর এক টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। এতে ছিল তাঁর চুল। এ চুল ও চিরুনীর দাঁতের ওপর জাদু করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লবীদ ইব্নে আসম নিজে জাদু করেছিল। অপর কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে, তার বোনেরা তার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী জাদুকর ছিল, তাদের দ্বারা এ কাজ করা হয়। সে যাই হোক, এ জাদু একটা পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে*

---

* কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে 'ইহুদী' বলেছেন। আবার কেউ বলছেন, সে ছিল মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধু বা মিত্র। তবে সে যে বনু যুরাইক্ গোত্রের লোক ছিল, এ বিষয়ে সকলেই একমত। আর বনু যুরাইক যে ইহুদীদের কোন গোত্র নয়, খাযরাজ ও আনসারদেরই গোত্র; তা সকলেই জানে। কাজেই সে হয় মদীনার ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যের একজন ছিল, কিংবা ইহুদীদের মধ্যে হওয়ার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদীই মনে করতো। তবুও তাকে 'মুনাফিক' বলায় এ কথা বুঝা যায় যে, সে বাহ্যত মুসলমানই ছিল।

* প্রথমে খেজুরের ছড়া একটা আবরণের দ্বারা পরিবেশিষ্টত থাকে। আর পুরুষ খেজুর গ্যছের এ আবরণের বর্ণ মানুষের বর্ণের সঙ্গে মিলে যায়। মানুষের শুক্রের গন্ধের মত তার গন্ধ হয়ে থাকে।

রেখে লবীদ বনু যাইকের 'যারওয়ান' কিংবা 'যী-আরওয়ান' নামক কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। নবী করীমের (সঃ) ওপর এ জাদুর ক্রিয়া হওয়ায় এক বছর সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় ছয় মাসে নবী করীমের (সঃ) স্বাস্থ্যে কিছুটা বিকৃতি অনুভূত হতে শুরু হয়।শেষ চল্লিশ দিন অবস্থা কঠিন এবং শেষ তিনদিন কঠিনতর হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু রসূলে করীমের (সঃ) ওপর এর খুব বেশী প্রতিক্রিয়া যা দেখা দিয়েছিল, তা শুধু এতটুকু ছিল যে, তিনি ক্রমশ নিস্তেজ নির্বীর্য হয়ে আসছিলেন। কোন কাজ করেছেন মনে হলেও দেখা যায়, তা করা হয়নি। তাঁর বেগমদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিল যে, তিনি তাঁদের নিকট গিয়েছেন, কিন্তু আসলে যান নি। কোন কোন সময় দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগতো। মনে হতো একটা জিনিস তিনি দেখেছেন অথচ আসলে তিনি তা দেখেননি। এ সব প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজ সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, তাঁর ওপর কি ঘটে যাচ্ছে, তা নিকটের লোকেরা জানতেও পারতো না। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তা যথাযথ পালন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারেনি। এ সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গেছেন, কিংবা কোন আয়াত তিনি ভুল পড়েছেন, অথবা তাঁর সংস্পর্শে, ওয়ায ও বক্তৃতায়, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় কোনরূপ পার্থক্য বা ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে, অহীর মাধ্যমে নাযিল না হওয়া কোন কালামকে তিনি অহীরূপে পেশ করেছেন, নামায তরক হয়ে গেছে এবং তিনি মনে করে নিয়েছেন যে তা পড়েছেন,অথচ পড়েননি,-এগুলো ও এধরনের কোন একটা কথাও ইতিহাসের এ বিপুল সম্ভারে কোন একটা ক্ষুদ্র বা ইংগিতপূর্ণ বর্ণনায়ও পাওয়া যাবে না। কেননা. খোদা না করুন এমন কোন ব্যাপার যদি আদৌ এবং কোন এক মুহূর্তেও ঘটে থাকতো তাহলে তা চারদিকে অবশ্যই রাষ্ট্র হয়ে যেতো। সমগ্র আরব চীৎকার করে উঠতো যে,যে নবীকে কোন শক্তিই পরাস্ত করতে পারেনি একজন সাধারণ জাদুকরের জাদুই তাঁকে হেস্তনেস্ত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। বস্তুত নবী করীমের ওপর জাদুর ক্রিয়া শুধু তাঁর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজ শরীরে ও স্বাস্থ্যে এ প্রতিক্রিয়া অনুভব করে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর নবুয়্যাতের মর্যাদা তিনি যে আল্লাহর নবী ছিলেন ও এ হিসেবে যে সব দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিশেষ গুণাবলী তাঁর ছিল তা পালনে ও আচরণে সম্পূর্ণ অপ্রভাবিত বা প্রভাবমুক্ত ছিল। জাদুর ক্রিয়া এর ওপর আদৌ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষদিকে তিনি একদিন হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহর নিকট পর পর দো'আ করলেন। সে মুহূর্তে তিনি নিদ্রাকাতর হয়ে পড়লেন কিংবা তন্দ্রা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। পরে তিনি জাগ্রত হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বললেন 'আমি আমার খোদার নিকট যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন'। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন 'তা কি'? নবী করীম (সঃ) বললেন 'দু'জন লোক (অর্থাৎ ফিরেশতা দু'জন লোকের বেশে) আমার নিকট এলো। একজন মাথার দিকে বসলো ও অপরজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞাসা করলো 'এর কি হয়েছে'? অপরজন উত্তর দিল এর ওপর জাদু করা হয়েছে'। সে জিজ্ঞাসা করলো 'কে জাদু করেছে'? উত্তরে বলা হলো 'লবীদ ইব্‌নে আসম'। জিজ্ঞাসা করলো 'কিসে জাদু করা হয়েছে? বলা হলো চিরুনী ও চুলে একটা পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণের মধ্যে রেখে তা করা হয়েছে'। জিজ্ঞাসা করা হলো তা কোথায়? বলা হলো বনু যুরাইকের 'যী-যারওয়ান' কূপের তলায় পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে'। এখন কি করা যেতে পারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হলো ঃ 'কূপের সব পানি সেঁচে দিয়ে পাথরের তলা হতে তা বের করতে হবে'। অতঃপর নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত 'আম্মার ইব্‌নে ইয়াসার (রাঃ) ও হযরত জুবাইর (রাঃ)কে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। যুবাইর ইব্‌নে এয়াস যুরকী ও কায়স-ইব্‌নে মিহসন যুরকী- অর্থাৎ বনু যুরাইকের এ ব্যক্তিদ্বয়ও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পরে নবী করীম (সঃ) নিজেও কতিপয় সাহাবী সংগে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। কূপ হতে পানি তোলা হলো এবং সেই খেজুর গাছের চূড়ার আবরণও উদ্ধার করা হলো। তাতে চিরুনি ও চুলের সংগে পেচানো 'একগাছি সূতোয় এগারোটি গেরো লাগানো ছিল। সে সংগে একটি মোমের পুটলি ছিল এবং তাতে কয়েকটি সুঁই বসানো ছিল। জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বললেন আপনি 'মু আব্বেযাতায়ন'- সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করুন'। এ নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) এক একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং এভে এক একটা গেরো

খুলে যেত ও পুতলি হতে এক একটা সুঁই বের করা হতো। শেষ পর্যন্ত পৌছার সংগে সংগে সব ক'টি গেরো খুলে গেল। সব সুঁই বের করা হলো এবং তিনি জাদুর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলেন। মনে হলো, আঁট-সাঁট বাঁধা এক ব্যক্তি যেন সহসা বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে। এরপর নবী করীম (সঃ) লবীদকে ডেকে তার নিকট এ জন্য কৈফিয়ত চাইলেন। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো, নবী করীম (সঃ)ও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা, তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারো ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এ ঘটনার চর্চা করতেও অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, আল্লাহই যখন আমাকে জাদু ক্রিয়া হতে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিয়েছেন, তখন আমি লোকদেরকে কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাই না।

জাদু সংক্রান্ত ঘটনার মোটামুটি কাহিনী এতটুকুই এবং নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতের পরিপন্থী কিংবা তার পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যাপারই এতে নেই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যদি আহত করা যেতে পারে ওহুদ যুদ্ধে যেমন হয়েছিল, অশ্বপৃষ্ঠ হতে যদি তিনি পড়ে যেতে পারেন- যেমন বহু হাদীস হতে প্রমাণিত, বিচ্ছু যদি তাঁকে দংশন করতে পারে- অন্য কিছু হাদীস হতে যেমন জানা যায় এবং এর মধ্যে কোন ঘটনাও যদি নবী হিসেবে তাঁর সংরক্ষণের জন্য দেয়া আল্লাহর ওয়াদার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে নবী করীমের (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে জাদুক্রিয়ায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া অসম্ভব হবে কেন? নবীর (সঃ) ওপর যে জাদুক্রিয়' কার্যকর হতে পারে, তা তো কুরআন হতেও প্রমাণিত। সূরা আ'রাফে ফিরাউনের জাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা যখন হযরত মূসার (আঃ) মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল, তখন এ 'জাদুকরদের' প্রতিযোগিতা দেখার জন্য উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টির ওপর তারা জাদুর প্রভাব বিস্তার করে দিল ঃ سحروا اعين الناس (১১৬ নম্বর আয়াত)। সূরা 'ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে যে সব লাঠি ও রশি তারা নিক্ষেপ করেছিল, সেগুলো দেখে কেবল সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসা (আঃ)ও মনে করলেন, সেগুলো সাপের মত তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। এতে হযরত মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি অহী নাযিল করে বললেনঃ'ভয় পেয়ো না, জয়ী তুমিই হবে। নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপ করতো'। আয়াতটি হলো ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۞ فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۞ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ -

'তাহাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠি গুলি মনে হইল যেন তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসছে এতে মূসা ভয় পেল। আমি বললাম, ভয় পাইও না, তুমিই বিজয়ী হইবে। তোমার ডান হাতের যষ্ঠি নিক্ষেপ কর' (৬৬-৬৯ নম্বর আয়াত)।

নবী করীমের (সঃ) ওপর জাদুর প্রভাব হতে পারে বা হয়েছিল, এ কথা মেনে নিলে মক্কার কাফেরদের প্রচারনাই সত্য প্রমাণিত হয়। তারা বলেছিল 'এ লোকটি জাদু প্রভাবিত'। এ তো ভালো কথা নয়। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, পূর্বোদ্ধৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মনে হয়। মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ)কে 'জাদু প্রভাবিত' বলতো এ কথা ঠিক, কিন্তু তাদের এ কথার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি কোন জাদুকরের ক্রিয়ায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ অর্থে তারা এ কথাটি বলতোও না। বরং তাদের এরূপ কথার অর্থ ছিল এবং আসলে তারা বুঝাতে চাচ্ছিল যে, কোন জাদুকর নবী করীম (সঃ)কে নাউযুবিল্লাহ পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর এ পাগলামীর কারণেই তিনি নবুয়্যতের দাবী করে বসেছেন ও বেহেশ্‌ত-দোযখের প্রলাপ বকছেন (এক কথায় নবুয়্যতকে তারা পাগলামীর ফলশ্রুতি ও নবীর প্রদত্ত শিক্ষাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলে প্রচারণা চালাতো)। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যখন এই যে, জাদুক্রিয়া নবী করীমের (সঃ) ব্যক্তিসত্তা, তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত কিন্তু নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতের ওপর তার বিন্দুমাত্র প্রভাবও প্রতিফলিত হয়নি, তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন অব্যাহত ছিল, তখন উক্ত ধরনের প্রশ্নের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এ প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ্য যেসব লোক 'জাদু'কে একটা নিছক কুসংস্কার মনে করে, তাদের এ ধারণার মূলে একটা ধারণাই কাজ করছে। তারা মনে করে, জাদু'র কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেই শুধু আসে, কিন্তু তা কিভাবে, তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোন কথা নেই।জাদু মূলতঃ একটা মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রামিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রামিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ভয় একটা মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু তা দেহে সংক্রামিত হয়ে ভয়ে লোমহর্ষণ ঘটে। দেহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার দরুন মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। হযরত মূসার প্রতি জাদুকররা লাঠি ও রশি নিক্ষেপ করেছিল। তা প্রকৃত পক্ষে সাপ হয়ে যায়নি। কিন্তু উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের চোখের ওপর এমন জাদু করা হয়েছিল যে তারা সেগুলোকে সাপই মনে করেছিল। এমনকি হযরত মূসার (আঃ) ইন্দ্রিয়নিচয়ও এ জাদুর প্রভাব হতে মুক্ত থাকেনি। সূরা আল বাকারার ১০২'নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'বেবিলনে হারুত মারুতের নিকট হতে লোকেরা এমন জাদু শিখত যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত।' আসলে এও একটি মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়াই ছিল মাত্র। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় মানুষ যদি এ প্রক্রিয়ার সাফল্য ও সম্ভাবতা বুঝতে ও জানতে না পারতো, তাহলে কেউ এ জিনিসের একবিন্দু গুরুত্ব দিত না। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোমার মত জাদুর কার্যকারীতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সহসা সহস্র বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ দুটো সূরা প্রসংগে আরও একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো, ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান কোথায়। ইসলাম কি এটা সমর্থন করে ও জায়েয বলে ঘোষণা করে? দ্বিতীয়ত ঝাড়-ফুঁকের আসলেই কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আছে কি? এ প্রশ্ন উথাপিত হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে। বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) নিজে প্রতি রাতে শোবার সময় আর বিশেষ করে অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে এই 'ফালাক্ব' ও 'নাস'সূরা অথবা কোন কোন বর্ণনা মতে 'কুলহু আল্লাহু' ও এদুটো সূরা তিন তিন বার পড়ে নিজের দুই হাতে ফুঁ দিতেন ও মাথা হতে পা পর্যন্ত পূর্ণদেহে-যতদুর তাঁর হাত পৌছাত -হাত দুখানি মলতেন। সর্বশেষ রোগে তিনি নিজে যখন এরূপ করতে পারছিলেন না, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হতে কিংবা নবী করীমের (সঃ) নির্দেশে এ সূরা কটি পড়ে বরকতের আশায় তাঁরই হাত মুবারকে সারা শরীরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, মুয়াত্তা ও ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। আর হযরত আয়েশা অপেক্ষা রসূলে করীমের ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল যে কেউ ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমরা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ বুঝতে চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ' ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন : 'আমার উম্মতের সেই সব লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে যারা দাগ্ দেয়ার চিকিৎসা করায় না এবং ঝাড়-ফুঁক করায় না, ফাল' গ্রহণ করে না! বরং নিজেদের আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে (মুসলিম)। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার বর্ণনা হলো, নবী করীম (সঃ) বললেন 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করালো ও ঝাড়-ফুঁক করালো, সে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল' (তিরমিযী)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণীত হয়েছে রসূলে করীম (সঃ) দশ.টি জিনিস অপছন্দ করতেন। তন্মধ্যে একটা হলো ঝাড়-ফুঁক। তবে 'সূরা ফালাক্ব' ও 'সূরা নাস' পড়া কিংবা 'কুলহু-আল্লাহু'সহ এ দুটো সূরা পড়া অপছন্দ করতেন না (আবু দাউদ,

আহমদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)। কোন কোন হাদীস হতে জানা যায়, শুরুতে নবী করীম (সঃ) ঝাড়-ফুঁকের কাজ সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ শর্তে তা করার অনুমতি দিলেন যে, তাতে শিরক হবে না, আল্লাহর পবিত্র নাম কিংবা তাঁর পাক কালাম পড়ে ঝাড়তে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে, তাতে যে কোন গুনাহের ব্যাপার নেই, তা জানা থাকবে। আর ভরসা ঝাড়-ফুঁকের ওপর থাকবে না, তা নিরাময় করতে পারে- এরূপ বিশ্বাস মনে রাখবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে, তিনি চাইলে তার উপকার দিবেন, এ আশাতেই এ কাজ করা যেতে পারে।

শরীয়তের এ দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করার পর হাদীসসমূহ হতে কি জানা যায় তাই বিবেচ্য। তাবরানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত 'আলীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'নবী করীমের (সঃ) নামায পড়াকালে একবার এক বৃিচ্ছু তাঁকে দংশন করে। নামায পড়া শেষ করে তিনি বললেন বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না অন্য কাকেও! পরে তিনি পানি ও নুন আনালেন এবং ক্ষতস্থানে নূনের পানি লাগাতে লাগাতে সূরা আল-কাফিরুন, সূরা ইখলাস ও এই শেষ দুটো সূরা পড়তে লাগলেন'

হযরত ইবনে 'আব্বাসেরও (রাঃ) একটা বর্ণনাহাদীসসমূহেউদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইনের (রাঃ) ওপর নিম্নোদ্ধৃত দোয়া পড়তেন ঃ

أُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

-'আমি তোমাদের দুজনকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিচ্ছি-প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক হতে এবং সব খারাপ নজর হতে' (বুখারী, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

মুসলিম, মুআত্তা, তাবরানী ও হাকেম প্রমুখ সামান্য শব্দগত পার্থক্য সহকারে উসমান ইবনে 'আবুল আস সকফী সম্পর্কে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবী করীমের (সঃ) নিকট অভিযোগ করে বললেন, 'আমি যে সময় হতে মুসলমান হয়েছি আমি একটা ব্যথা অনুভব করছি। ব্যাথাটি আমাকে যেন মেরে ফেলতে চায়'। নবী করীম (সঃ) বললেন তোমার ডান হাত ব্যথার স্থানে রাখ এবং তিন বার বিসমিল্লাহ বল আর এই দোয়াটি সাত বার পড়ে তার ওপর হাত ফেরাও ঃ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

-'আমি আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের পানাহ্ চাই সে জিনিসের অনিষ্ট হতে যা আমি অনুভব করি আর যা লেগে যাওয়ার আমি ভয় পাই'।

মুআত্তা গ্রন্থে এ কথাও রয়েছে যে, উসমান ইবনে আবুল আস বললেনঃ 'এরূপ করার পর আমার সে ব্যাথা দূর হয়ে যায়। আমি আমার ঘরের লোকদেরকেও এ জিনিসের শিক্ষা দিচ্ছি'।

মুসনাদে আহমদ ও তাহাভী গ্রন্থে তুলুক ইবনে আলীর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন ঃ নবী করীমের উপস্থিতিতে বিচ্ছু আমাকে দংশন করে। নবী করীম (সঃ) কিছু পড়ে আমার ওপর ফুঁক দিলেন ও ক্ষতস্থানে হাত লাগালেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'হে মুহাম্মদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন'? তিনি বললেন হাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ
حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

'আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন সব জিনিস হতে, যা আপনাকে পীড়া দেয় এবং প্রত্যেক নফ্স ও হিংসুকের দৃষ্টির অনিষ্ট হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।'

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অনুরূপ কথা হযরত উবাদাহ্ ইব্‌নে সামেত হতে উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) অসুস্থ ছিলেন। আমি দেখতে গেলে তাঁকে খুব কষ্টের মধ্যে পেলাম। সন্ধ্যাকালে পুনরায় গেলে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখলাম। এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি কিছু 'কালেমা' দিয়ে আমাকে ঝাড়লেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের কথাগুলো তাঁকে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্‌সার (রাঃ) একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। "একদিন নবী করীম (সঃ) আমার ঘরে এলেন। আমার নিকট তখন 'শিফা'* নামে এক মহিলা বসেছিলেন। তিনি নামেলাকে (যুবাব) ঝাড়তেন। নবী করীম (সঃ) বললেন 'হাফ্‌সাকেও সে প্রক্রিয়া শিখিয়ে দাও'। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ বর্ণনাটি তাঁর নিজের জবানীতে মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) নিজেই আমাকে বললেন 'তুমি হাফসাকে যেভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছ, নামেলাকে ঝাড়বার প্রক্রিয়াও সেভাবে তাকে শিখিয়ে দাও'।

মুসলিম শরীফে 'আউফ ইব্‌নে মালেক আশজায়ীর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ জাহেলিয়াতের জামানায় আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলে করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম এ বিষয়ে তাঁর অভিমত কি? নবী করীম (সঃ) বললেন 'তোমরা যে সব জিনিস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতে তা আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই, যদি তাতে শিরক্ না থাকে'।

মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌নে মাজা'য় হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। পরে হযরত আমর ইব্‌নে হাজমের বংশের লোকেরা এলো ও বললো 'আমরা একটা প্রক্রিয়া জানতাম, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর (বা সাপের) দংশন হলে ঝাড়তাম। কিন্তু আপনি এটা নিষেধ করে দিলেন।' পরে তারা নবী করীম (সঃ)কে ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র পড়ে শুনাল। তিনি বললেন 'এতে তো কোন দোষ দেখি না। তোমাদের কেউ যদি কোন ভাইকে উপকার দিতে পারে তবে সে যেন তা অবশ্যই করে'।

জাবির ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'হাজম বংশের লোকদের নিকট সর্প-দংশন চিকিৎসার একটা প্রক্রিয়া ছিল, নবী করীম (সঃ) তা প্রয়োগের অনুমতি দেন'। মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌নে মাজায় উদ্ধৃত হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিতে তার সমর্থন রয়েছে হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) আনসারদের এক বংশকে বিষাক্ত জীবের দংশন চিকিৎসায় ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, মুসলিম ও ইব্‌নে মাজায় হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ কথার কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী করীম (সঃ) বিষধর জীবের দংশন, যুবাব রোগ ও কুদৃষ্টি ঝাড়ার অনুমতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইব্‌নে মাযাহ ও হাকেমে হযরত উমাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হলো, 'জাহেলিয়াতের জামানায় একটা প্রক্রিয়া আমার জানা ছিল, আমি তার দ্বারা ঝাড়ফুঁকের কাজ করতাম। আমি নবী করীমের (সঃ) সমীপে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'এ হতে অমুক জিনিস বাদ দাও। অবশিষ্ট দ্বারা তুমি ঝাড় ফুঁকের কাজ চালাতে পার।'

মুআত্তা গ্রন্থে বলা হয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা'র (রাঃ) ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে আছেন এবং একটা ইহুদী মেয়ে লোক তাঁকে ঝাড়ছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়। এ হতে জানা গেল, আহলি কিতাবের লোক যদি তওরাত বা ইনজীলের আয়াত পড়ে ঝাড়ে তা হলেও জায়েয হবে।

* মহিলার আসল নাম ছিল 'লাইলা'। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে সাধারণত পরিচিতা ছিলেন। হিজরাতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। বনু আদী নামক একটি কুরাইশ বংশের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)ও এ বংশেরই লোক ছিলেন। এভাবে উক্ত মহিলা হযরত হাফসা'র (রাঃ) আত্মীয়া ছিলেন।

এর পর প্রশ্ন থাকে ঝাড়-ফুঁকে কোনউপকারসত্যই হয় কি? এর উত্তর হলো, নবী করীম (সঃ) ওষুধ ব্যবহার ও রোগের চিকিৎসা করতে কখনো নিষেধ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক রোগের ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা ওষুধ ব্যবহার ও রোগের চিকিৎসা কর।' নবী করীম (সঃ) নিজে কোন কোন রোগের ওষুধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুত-তিব' 'চিকিৎসা গ্রন্থ দেখলেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। কিন্তু আসল কথা, ওষুধও উপকার করে আল্লাহর অনুমতিতে, তাঁর হুকুমে। নতুবা সকল প্রকার ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি যদি অমোঘ হতো, অনিবার্যভাবে উপকার করতো ও কার্যকর হতো, তাহলে অন্ততঃ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে কেউ মরতো না। কাজেই ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের সংগে সংগে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর পবিত্র নামসমূহ পড়ে ফায়দা পেতে চাওয়া হয়, কিংবা যেখানে কোনরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণের কোন উপায় নেই, সেখানে যদি একান্তভাবে আল্লাহর দিকে 'রুজু' করে তাঁর কালাম ও 'আসমায়েহাসানা' পড়ে ফায়দা পেতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে বস্তুবাদীদের ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আপত্তির কারণ হবে না- সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হবে না* তবে ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার এ সুযোগে কিছু লোকের আমল-তাবীজ ইত্যাদির দোকান খুলে বসা ও তাকেই উপার্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করা- এ কখনই শোভনীয়, বাঞ্ছনীয় ও উচিত হতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর একটা বর্ণনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাযায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনাটা তার সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠালেন হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রাঃ) তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এ লোকেরা রাতে আরবের এক গোত্রের বস্তিতে গিয়ে থাকলেন। তারা গোত্রের লোকদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা আমাদের মেহ্‌মানদারীর ব্যবস্থা কর'। তারা এটা করতে অস্বীকৃতি জানালো। ইতিমধ্যে গোত্রপতিকে বিচ্ছু দংশন করলো। লোকেরা এ পথিকদের নিকট দৌড়ে এলো, বললো 'তোমাদের কাছে কোন ওষুধ কিংবা প্রক্রিয়া আছে নাকি, যার দ্বারা তোমরা আমাদের সরদারের চিকিৎসা করতে পার'? হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন আছে তো বটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাদের মেযবানী করতে অস্বীকার করেছ এ জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কিছু দিতে রাজি না হবে, ততক্ষণ তার চিকিৎসা করবো না। তারা চিকিৎসার বিনিময়ে এক পাল কিংবা ৩০টি ছাগল দেয়ার ওয়াদা করলো। অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী গিয়ে সরদারের উপর সূরা ফাতেহা পড়তে শুরু করলেন এবং মুখের থুথু ক্ষতস্থানে লাগাতে লাগলেন*। শেষ পর্যন্ত বিষক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা যত ছাগল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা সবই এনে পেশ করলো। কিন্তু তাঁরা আপসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এসব ছাগল গ্রহণ করবেন না- যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করা না হবে। এ কাজে কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না, তা তো জানা নেই। পরে এরা নবী করীমের নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিবরণ পেশ করলেন। নবী করীম (সঃ) হেসে উঠে বললেন এই সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুকও করা যায়, তা তোমরা কিভাবে জানতে পারলে?... ছাগলগুলো গ্রহণ কর এবং তাতে আমার অংশও ঠিক কর।

---

* বস্তুবাদী জগতের বহু চিকিৎসাবিশারদ স্বীকার করেছেন যে, দো'আ ও আল্লাহর দিকে 'রুজু রোগীর আরোগ্য লাভে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। আমি নিজের জীবনে দুবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি। ১৯৪৮ সনে আমাকে বন্দী করা হলে কয়েকদিন পর আমার মূত্রনালীতে একটি পাথর টুকরা এসে আটকে যায়। ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ থাকে। আমি আল্লাহর নিকট দো'আ করলাম। বললাম ঃ আল্লাহ! আমি যালেমদের নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করবো না, তুমিই আমার রোগ সারিয়ে দাও, কষ্ট দূর করে দাও। পরে দেখা গেল, সে পাথর সরে গেছে। ২০ বছর পর্যন্ত তা সরেই থাকলো। ১৯৬৮ সালে আবার কষ্ট দেখা দিল। তাকে অপারেশন করে বের করা হল। ১৯৫৬ সালে আমাকে দ্বিতীয়বার যখন আটক করা হয়, তখন আমার উভয় পায়ে দাদের ভয়নক কষ্ট দেখা দিল। কোনরূপ চিকিৎসায়ই তা সারছিল না। তখন আমি আল্লাহর কাছে আবার দো'আ করলাম- যেমন ১৯৪৮ সনে করেছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে কোনরূপ ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যতীতই এ রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল এবং আজ পর্যন্ত সে রোগ আমার হয়নি।

অনেক ক'টি বর্ণনায়ই এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, এ প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীই (রাঃ) ছিলেন। এমনকি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) এ অভিযানে শরীক ছিলেন সে কথাও অনেক হাদীসে বলা হয়নি। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় এ দুটো কথাই স্পষ্ট বলা হয়েছে।

এ হাদীসের ভিত্তিতে তাবীজ, তুমার ও ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালনা জায়েয বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ মত নির্দিষ্ট করার পূর্বে তদানীন্তন আরবের সে পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক, যাতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এ কাজ করেছিলেন এবং নবী করীম (সঃ) তাকে শুধু জায়েযই বলেননি তার আয়ে নিজের অংশও নির্দিষ্ট করতে বলেছিলেন। আর এর দরুন এ লোকদের মনে এ কাজের জায়েয বা না-জায়েয হওয়ার সন্দেহ যেন অবশিষ্ট থাকলো না। তদানীন্তন আরব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বড়ই আশ্চর্য ধরনের ছিল। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ,শত শত মাইল চলেও সেখানে কোন লোকবসতি দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল তখনকার সময়ই নয়। এখনো সে অবস্থা সর্বত্র বিরাজিত। আর এ বিরল জনবসতিও এমন যে, কোথাও হোটেল কিংবা সরাইখানা নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও পাওয়া যায় না। পথিক একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত চলেও কোথাও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবার সুযোগ পায় না। এ পরিস্থিতিতে পথিক কোন বস্তিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকদের পক্ষে তার আতিথ্য করা কর্তব্য। উক্তরূপ অবস্থায় এ ছিল আরবের সাধারণ সামাজিক ও প্রচলিত নৈতিক আদর্শ। কেননা, এরূপ অবস্থায় মেহমানদারী করা না হলে অনেক সময় পথিক মৃত্যুমুখে পতিত হতে বাধ্য। সে জন্যে আতিথ্য না করা আরব সমাজে খুবই অপছন্দ করা হতো। এ কারণে গোত্রের লোকেরা যখন এ লোকদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের গোত্রপতির চিকিৎসা করার বিনিময়ে কিছু জিনিস দাবী করা তাদের পক্ষে জায়েয ছিল বলে নবী করীম (সঃ) ঘোষণা করেছিলেন। চিকিৎসার পর সরদার যখন নিরাময় হয়ে গেল ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেয় এনে পেশ করলো, তখন তা গ্রহণ করাকেও নবী করীম (সঃ) নাজায়েয বললেন না। বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাসের (রাঃ) যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে নবী করীমের (সঃ) কথা এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُم عَلَيهِ اَجرًا كِتَابُ اللهِ

অর্থাৎ 'তোমরা অন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার পরিবর্তে কুরআন পড়ে যে তার পারিশ্রমিক নিয়েছ, এটাই অধিক ভালো কাজ হয়েছে'।

নবী করীম (সঃ) এ কথা বলেছেন এ জন্য যে, অন্যসব আমল বা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কালামের স্থান অনেক উর্ধে। এছাড়া আরবের সে গোত্রের লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজও এভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারা নবী করীমের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কালামের বরকত বুঝতে পেরেছে। কাজেই যারা শহর কিংবা গ্রামে ঘুরে ফিরে ঝাড়ফুঁকের ব্যবসায় চালায় ও তাকেই যারা জীবিকা নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) সংক্রান্ত এ ঘটনায় তাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাদের এ কাজ জায়েয হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সঃ), সাহাবা-এ কিরাম, তাবেঈন এ কাজকে জীবিকা নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে না।

সূরা ফাতিহার সঙ্গে এ সূরা দুটোর সম্পর্ক

সূরা ফাতিহা কুরআন মজীদের প্রথম সূরা। আর সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' কুরআনের সর্বশেষে সংযোজিত সূরা। এ সূরা দুটোর সঙ্গে সূরা ফাতিহা'র সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য কি, ঐ পর্যায়ে তাই আমাদের আলোচ্য।

কুরআন মজীদের সূরাসমূহ নাযিল হওয়ার পারম্পর্য অনুসারে গ্রন্থাকারে সাজানো হয়নি। কিন্তু তেইশ বছরের দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, ক্ষেত্র ও প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহকে নবী করীম (সঃ) নিজের ইচ্ছামত নয়, তার অবতীর্ণকারী স্বয়ং আল্লাহতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ীই তা সুসজ্জিত ও গ্রন্থবদ্ধ করেন। বর্তমান সময়ে কুরআন মজীদকে আমরা সেভাবেই পাচ্ছি। এপরম্পরা অনুযায়ী কুরআনের সূচনাতে রয়েছে সূরা 'ফাতিহা' তার সমাপ্তি হয়েছে সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'ন্নাস' দ্বারা। এ শুরু ও শেষেব সূরা ক'টির ওপর সম্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ

করলেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। শুরুর সূরায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রহমান, রহীম ও বিচার দিনের মালিকের হামদ্ ও স্তুতি করে বান্দা প্রার্থনা করে। 'হে রব! আমি তোমারই বন্দেগী করি। তোমরই কাছে সাহায্য চাই। আর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সাহায্য আমার দরকার, তা হলো, আমাকে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন কর।' জবাবে আল্লাহতা'আলার তরফ হতে সত্য নির্ভুল পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ কুরআন মজীদ তাকে দেয়া হয়। আর সেই কুরআন শেষ করা হয়েছে যে কথা বলে, তা হলোঃ বান্দাহ রব্বুল ফালাক, রব্বুন নাস, মালেকুন্নাস ও ইলাহুন্নাস আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে আমি সব সৃষ্টির সব রকমের বিপর্যয়-অশান্তি ও অনিষ্ট হতে সুরক্ষিত থাকার জন্য (হে আল্লাহ!) তোমারই পানাহ্ চাই। বিশেষ করে মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের অসঅসা-ধোঁকা প্রতারণা হতে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, হেদায়াতের সত্য-সঠিক-নির্ভুল পথে চলার ব্যাপারে তারাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে কুরআন মজীদের 'শুরু' ও 'শেষে'র মাঝে যে এক মর্মস্পর্শী নিবিড় সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছে, তা কোন দৃষ্টিবানের নিকটই গোপন থাকতে পারে না।

أُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِّن كُلِّ شَيطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِن كُلِّ عَينٍ لاَّمَّةٍ

এক তার রুকু মক্কী ফালাক সূরা পাঁচ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

বল তুমি, আমি আশ্রয় চাই, রবের নিকট, উষার, হতে, অনিষ্ট, যা, তিনি সৃষ্টি করেছেন, হতে এবং, অনিষ্ট, অন্ধকারকারী

اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَ مِنْ

যখন, আচ্ছন্ন হয়, হতে এবং, অনিষ্ট, ফুঁকদানকারীর (রাতের) অনিষ্ট, মধ্যে, গিরাগুলোর, এবং, হতে

شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অনিষ্ট, হিংসুকের, যখন, সে হিংসা করে

সূরা আল্-ফালাক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াতঃ ৫ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২. বল আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টা রবের নিকট [১] সে সব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৩. আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় [২]।

৪. এবং গিরায় ফুঁক দানকারী (বা ফুঁক দানকারিনী)'র অনিষ্ট থেকে [৩]

৫। ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকে - যখন সে হিংসা করে[৪]।

১। অর্থাৎ সেই প্রভুর যিনি রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে উজ্জ্বল প্রভাতের বিকাশ ঘটান।
২। কারণ বেশীর ভাগ অপরাধ, অত্যাচার ও পাপ রাত্রিতেই সংঘটিত হয় এবং ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারী জন্তু জানোয়ারও অধিকাংশ রাতেবাহির হয়।
৩। অর্থাৎ পুরুষ যাদুকর ও স্ত্রী যাদুকারিনী।
৪। অর্থাৎ যখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে কোন ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে।

এক তার রুকূ মক্কী নাস সূরা ছয় তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

তুমি বল | আমি পানাহ চাই | রবের নিকট | মানুষের | বাদশাহর (নিকট) | মানুষের | ইলাহর (নিকট) | মানুষের

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ﴿۴﴾ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ

হতে | অনিষ্ট | অসঅসাদাতার | যে বার বার ফিরে আসে | যে | অস্অসা দেয় | মধ্যে

صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

অন্তরসমূহের | মানুষের | মধ্য হতে | জ্বীনের | ও | মানুষের

সূরা আন্-নাস
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াতঃ ৬,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-৩। বল, আমি পানাহ চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট
৪। বার বার ফিরিয়ে আসা অস্অসা উদ্রেককারীর অনিষ্ট থেকে [১],
৫-৬। যে লোকের দিলে অস্অসার উদ্রেক করে, সে জ্বিনের মধ্য হতে হোক, কি মানুষের মধ্য হতে [২]।

১। অর্থাৎ একবার 'অস্অসা'-'কুপ্ররোচনা' নিক্ষেপ করে যখন ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম না হয়, তখন সরে যায় এবং পুনরায় এসে অন্তরে কু-প্ররোচনা নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে পুনঃ পুনঃ এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

২। এই 'অস্অসা'-দাতা-এই পৌনঃ পুনিক কু-প্ররোচনা নিক্ষেপকারী মানুষই হোক বা জ্বিন (শয়তান) হোক-উভয়েরই কু ও অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।